খড়কুটো

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ . সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৭১
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৭১
চতুর্থ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৭৩
পঞ্চম মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৭৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৭৪
সপ্তম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৭৫
অষ্টম মুদ্রণ : ফাল্গুণ ১৩৭৫
নবম মুদ্রণ : ফাল্গুণ ১৩৭৬
দশম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮
একাদশ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১
দ্বাদশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৮৪

শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

১

অন্ধকার আকাশের তলায় দেখতে-দেখতে একটি আলোর ময়ূর ফুটে উঠল অবিকল সেই রকম কণ্ঠ, সেই পুচ্ছ। আলোর ফুলকিগুলো যেন ভাসছিল তারপর ওই আকৃতি তরল হয়ে ভাসমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন কাঠিন্য হারাতে শুরু করল। ময়ূরটির আকার যত বাড়ছিল, তার প্রত্যঙ্গগুলি ততই গলে যাচ্ছিল কিছু সোনালী তারা, কিছু রূপালী স্ফুলিঙ্গ আরও ওপরে উঠে আকাশের তারাদল প্রায় যেন স্পর্শ করল; কণ্ঠ এবং পুচ্ছ থেকে খচিত কণাগুলি নক্ষত্র-চূর্ণের মতন বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে নেমে আসতে-আসতে নিবে যাচ্ছিল। শেষে যখন আলোর ময়ূরটি অন্ধকারেই হারিয়ে গেল তখন কয়েকটি মাত্র রূপালী ফুল বৃষ্টির ফোঁটার মতন গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ল, মাঠের ঘাস স্পর্শ করার আগেই ছাই হয়ে গেল।

চারপাশে অফুরন্ত খুশীর গুঞ্জন ছিল; ক্রমশ মাঠে রোল উঠল। গলা ছেড়ে, হাততালি দিয়ে এই ময়ূরের বাজিকরকে সকলে বাহবা দিচ্ছিল। ততক্ষণে আকাশতলায় আবার অন্ধকারের যবনিকা ছড়িয়ে গেছে।

অমল প্রবল উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়েছে অনেকক্ষণ, অবশেষে সবাই থেমে গেলে সেও থেমে গেছে। তার মুগ্ধ উত্তেজিত চোখমুখ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু গলার স্বরে তার রোমাঞ্চ বোঝা যাচ্ছিল। পাশে ভ্রমর ভ্রমরকে বার বার সে বলছিল, "বিউটিফুল। আমি কখনও দেখি নি এ-রকম যে তৈরী করেছে, সে একজন আর্টিস্ট। কী রকম সুন্দর গলাটা করেছিল দেখেছ।"

ভ্রমর যেন তখনও আলোর ময়ূরটিকে চোখের মধ্যে কোথাও দেখতে পাচ্ছে ঝিকমিক ঝিকমিক করে জ্বলছে ছবিটা। বিরিজমোহন প্রত্যেক বছর দেওয়ালিতে রাজ-ময়দানে এই রকম সুন্দর সুন্দর বাজি পোড়ানো দেখায়।

"গত বছরে একজোড়া রাজহাঁস দেখিয়েছিল। খুব সুন্দর।" ভ্রমর বলল।

লাউডস্পীকারের গলা ততক্ষণে পরের দ্রষ্টব্য বিষয়টি ঘোষণা করেছে। হিন্দীতেই বলা হচ্ছিল। বাজি পোড়ানোর আগামী খেলাটাই শেষ। ঠিক বোঝা গেল না কি নাম বললে, শুধু আটামল কোম্পানী আর বোম্বাই শব্দ দুটো কানে গেল।

রাজ-ময়দানের চতুর্দিকে লোক। মাঠ ঘিরে সব বসে আছে। উত্তরের দিকে রাজবাড়ির মহল। আলোর মালা পরানো প্রাচীন প্রাসাদ। গম্বুজের চুড়োয় তিনটি নীল তারা জ্বলজ্বল করছে। পূর্ব-পশ্চিমে গাছের সার, মস্ত মস্ত ঝাউ আর শিরীষ গাছ; অন্ধকারে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণের দিকে

স্ট্যান্ড; কাঠের তক্তা গ্যালারীর মতন করে পাতা। ব্যবস্থাটা স্থায়ী। খেলাধুলো হয় এই মাঠেই, ফলে স্ট্যান্ডটা রেখে দেওয়া হয়েছে।

অমলরা স্ট্যান্ডেই বসেছিল। ওদের পাশে মোহনচাঁদরা বাড়িসুদ্ধ লোক বসে আছে।

তার ওপাশে আছে যোশীরা। যোশীদের দিক থেকে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, ভ্রমরকে, হিন্দীতেই। ভ্রমর নীচু গলায় জবাব দিল।

অমল বলল, "কে?"

"পুষ্পা।"

"কি বলল?"

"এবারে মাঠে জোনাকি জ্বলবে।"

অমল বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে শুধোল। "কেন? হঠাৎ জোনাকি জ্বলবে কেন?"

"বাজি; জোনাকির বাজি দেখাবে এবার।"

অমল কল্পনা করতে পারল না, সেটা কি করে সম্ভব হবে। সারা মাঠ ভরে জোনাকি উড়বে নাকি? অথবা অন্যান্য বাজি পোড়ানো যেরকম দেখল, একটা মস্ত ফানুস কি হাউই আকাশে উড়ে গিয়ে তারপর ফেটে পড়বে, সারা আকাশ পিটপিট জোনাকি-আলোয় ছেয়ে যাবে! হর্ষ, রোমাঞ্চ ও অগাধ বিস্ময় নিয়ে অমল মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল।

এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত বাজি পোড়ানোর খেলা, এর একটা মাত্র অসুবিধে এই, একটা শেষ হলে অন্যটা শুরু হতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। যারা বাজি পোড়াবে, তারা তাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে, এটা আনে সেটা আনে, ব্যবস্থা পাকা করে নেয় সব—ফলে সময় যায় অনেকটা; কিন্তু যারা দেখে, তারা অধীর হয়ে পড়ে। অমল বুঝতে পারল না, মাঠে বাজি পোড়ানো হবে, অথচ কতক ছায়া-সদৃশ লোক আলো হাতে চারপাশে ছোটাছুটি করছে কেন?"

"আচ্ছা, মেসোমশাই সেই যে গেলেন, আর এলেন না?" অমল বলল। বাজি পোড়ানো দেখতে সে এত তন্ময় যে, আনন্দমোহনের কথা ভুলে গিয়েছিল।

ভ্রমর বলল, "বাবা বোধ হয় রাজবাড়ির দিকে বসে গল্প করছেন।"

"কৃষ্ণাও ত এল না।"

"এসেছে ঠিক; ওর বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে; বন্ধুদের সঙ্গেই বসে আছে।"

ভ্রমরের কথা শেষ হতে-না-হতেই মাঠের অন্ধকারে একটি আলো দপ করে উঠল, ঠিক মাঝ-মধ্যিখানটায়। তারপর চোখের পলকে মাটির অন্ধকার থেকে ফোয়ারার মতন আলোর ধারা উঠল; উঠল ত উঠলই, গাছের মাথা-সমান উঁচু হয়ে রঙমশালের তারার মতন, তুবড়ির ফুলের মতন ফরফর করে পড়তে লাগল, জ্বলতে থাকল, নিবতে থাকল। আর সেই আলোর ফোয়ারা নিস্তেজ হয়ে আসতে না আসতেই, কী আশ্চর্য, মাঠের কোণে-কোণে, দূর ও কাছের গাছ-গুলির অন্ধকারে থোকা-থোকা জোনাকি জ্বলতে থাকল। এই এখানে জ্বলে, ওই ওখানে জ্বলে, কখনও ঘাসের মাথায় এক মুঠো জোনাকি দপ করে ফুটে ওঠে, কখনও দূরে শিরীষ অথবা ঝাউগাছের গোড়ায় জোনাকিদল নাচতে থাকে।

দেখতে-দেখতে চারপাশে যেন জোনাকির মেলা বসে গেল। টিপটিপ করে নীলাভ আলোর বিন্দুগুলি জ্বলছে নিবছে পাক পাচ্ছে, নাচছে, বাতাসে ছিটবে,

আসছে, উঁচুতে উঠছে, মাটিতে পড়ছে। মনে হচ্ছিল, একদল লোক যেন মাঠ ও গাছগাছালির কাছে গিয়ে অন্ধকারে জোনাকির পিচকিরি ছুঁড়ে মারছে, আর পলকে অন্ধকারের বসনে জোনাকি ধরে যাচ্ছে।

স্ট্যান্ড ডিঙিয়ে, বেড়া টপকে, মাঠের এ-পাশ ও-পাশ থেকে বাচ্চা-বাচ্চা, মেয়ে ও ছেলেরা, এমন কি কত বুড়োবুড়ীও মহানন্দে হই-হট্টগোল তুলে সেই জোনাকি কুড়োতে মাঠের মধ্যে গেল।

ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি চলতে থাকল সমানে। কত লোক হাসছে, গায়ে-গায়ে পড়ছে, ডাকছে নাম ধরে, আর ছেলেমানুষের মতন সেই জোনাকি ধরার খেলায় মত্ত হয়ে সারা মাঠ ছুটছে।

অমলেরও ইচ্ছা হয়েছিল লাফ মেরে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে। কিন্তু তার সামনে পিছনে যে অট্টরোল হুড়োহুড়ি, তার মধ্য দিয়ে পথ করে নেওয়া অমলের সাধ্যাতীত। ইচ্ছা এবং বাসনা সত্ত্বেও অমল বসে থাকল। বসে-বসে ওই আশ্চর্য ও চমৎকার দৃশ্যটি বিমুগ্ধ চিত্তে দেখতে লাগল।

অবশেষে মাঠ ও গাছভরা জোনাকিরা রাজ-ময়দান অন্ধকার করে আবার চলে গেল।

দেওয়ালির বাজি পোড়ানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভিড় জমেছিল বেশ। প্রথম দিকে ওরা কেউ উঠল না, বসে থাকল। যোশীদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা চলে যাবার সময় ভ্রমরকে বলল, হিম পড়ছে, বেশীক্ষণ আর বসে থেকো না।

হিম পড়ছিল। ভিড়ের মধ্যে বসে বাজি পোড়ানো দেখতে-দেখতে এখানকার শেষ কার্তিকের গায়ে-লাগা শীত তেমন অনুভব করা যায় নি। ভিড় পাতলা হয়ে এলে অমল বেশ ঠান্ডা লাগছে বুঝতে পারল। উঠল; বলল, "চলো।"

পাতলা রকমের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অমল ভ্রমরের উষ্ণ হাত ধরে ধরেই হাঁটছিল। হাতে হাত ধরে থাকার মতন যদিও ভিড় নেই, তবু ভ্রমরকে লোকজন, অন্ধকার এবং কাঠকুটো পড়ে থাকা জায়গা দিয়ে একা-একা হেঁটে যেতে দিতে অমলের ইচ্ছে হল না। ভ্রমরের বাঁ পা একটু ছোটো, মোটা গোড়ালিঅলা জুতো পরে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটে। দু-পায়ে যার সমান জোর নেই, তাকে হাতে ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত, কোথাও কিছুতে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে।

মাঠের বাইরে টাঙার ভিড়। আনন্দমোহনকে দেখা যাচ্ছিল না; কৃষ্ণাকেও নয়। টমটম ভাড়া করে যে যার চলে যাচ্ছিল, অনেকে হেঁটেই বাড়ি ফিরছে। মেলাভাঙা ভিড়ের মতনই দেখাচ্ছিল দৃশ্যটা।

"মেসোমশাই কোথাও নেই।" অমল যতটা সম্ভব চারপাশ দেখতে-দেখতে বলল; তার শীত করছিল এবার। জামার তলায় যদিও সোয়েটার আছে, তবু ঠান্ডা লাগছিল।

ভ্রমর দেখছিল একে-একে সবাই চলে যাচ্ছে, টাঙার দিকটা খালি হয়ে আসছে। বলল, "বাবা হয়ত গল্প করছেন, পরে যাবেন।"

"আমরা তা হলে বাড়ি ফিরি। কি বলো?"

মাথা নাড়ল ভ্রমর, বাড়ি ফেরাই ভাল।

টাঙা জুটিয়ে অমল ভ্রমরকে গাড়িতে তুলল, তারপর নিজে উঠে বসল।

"মোতি রোড; কালেজ—।" ভ্রমর টাঙাঅলাকে পথ বলে দিল। টাঙাঅলা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে লাগল।

এই জায়গাটা শহরের প্রায় প্রত্যন্ত। চওড়া রাস্তা, বেশ ছিমছাম, বাতি আছে দূরে দূরে; গাছগাছালি সার করে দু-পাশে দাঁড়িয়ে- ঘোড়ার গলার ঘণ্টি বাজছিল ঝুমঝুম করে, মাঝে মাঝে পা দিয়ে ঘণ্টির মাথা টিপে গাড়ির ঘণ্টি বাজিয়ে পথ করে নিচ্ছিল কোচোআন। রাস্তায় জটলা জটলা ভিড়, দু-চারজনের ছোট ছোট দলও আছে। বাজি পোড়ানো দেখে বাড়ি ফিরছে সবাই। হুস-হাস করে সাইকেল চলে যাচ্ছে, দু-একটি মোটর গাড়িও; বাকি যা যাচ্ছে সবই টমটম।

রাস্তায় এসে অমল প্রথমে স্পষ্ট করে কুয়াশা দেখতে পেল। এত কুয়াশা হয়েছে কখন কে জানে! হয়ত বহুক্ষণই এই রকম কুয়াশা জমে আছে, অমলের খেয়াল হয় নি। শীতটাও বেশ গায়ে লাগছে। মাথা হাত ঠাণ্ডা, কনকন করছিল। নাক এবং গলার মধ্যে জ্বালা-জ্বালা লাগল একটু। অমল পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল বার কয়েক।

"ঠাণ্ডা লাগল?" ভ্রমর শুধালো।

"না, লাগে নি। গলার মধ্যে চুলকোচ্ছিল কেমন!"

"তখনই বলেছিলাম কোট নিতে মাফলার নিতে." ভ্রমর বলল, 'এখানে দেওয়ালির অনেক আগেই শীত শুরু হয়ে যায়।"

"এবারে কি বেশী শীত?"

"না। এই রকমই।"

"আমার কিন্তু ক'দিনের মধ্যে আজই যেন বেশী মনে হচ্ছে।"

ভ্রমর জলের ঢোক গেলার মত শব্দ করে হাসল একটু। বলল, "আজ যে ঘরের বাইরে, তাই. .।"

কথাটা হয়ত ঠিকই বলেছে ভ্রমর। অমল এখানে এসেছে আজ আট দিন, না, আট দিন নয়, ন'দিন। এসে পর্যন্ত সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকে নি; আজই যা দেওয়ালি আর বাজি পোড়ানো দেখতে বেরিয়েছে।

অমল বলল, "আমরা শহরের মধ্যে দিয়ে যাব না?"

"না। চকের পাশ দিয়ে চলে যাব।"

"তা হলে ত দেওয়ালি দেখতে পাব?"

"পাব। আজ এরা খুব হইচই করে।"

"করবে, বছরে মাত্র একটা দিন। আমরাও করি; আমরা ত চার দিন ধরে করি, এরা সে জায়গায় একটা কি দুটো দিন।" অমল এমনভাবে বলল, যেন উৎসব করার চালাও অনুমতি দিয়ে রাখল লোকগুলোকে।

ভ্রমরের গায়ে পশমের একটা স্কার্ফ ছিল; নীল রঙের। অন্ধকারে ওটা কালো মনে হচ্ছিল। ভ্রমর অমলের দিকে একটু স্কার্ফ দিল। বলল, "এখানেও দুর্গা পুজো হয়।"

"এখানেও ! কারা করে?"

"বাঙালীরা।"

"বাব্বা, এত বাঙালী আছে এখানে?" অমল বেশ অবাক।

"অনেক নেই, একশো-দ্যাকশো আছে--। বাবাদের কলেজে আছে বৈ.

সারভে অফিসে জনাকয়েক, ডাক্তার আছে একজন, মিউজিয়ামে একজন..."

"পঁচিশজনও হল না।" অমল হাসল, "তুমি অঙ্কে একেবারে সরস্বতী।"

ভ্রমর যেন প্রথমে বুঝল না, পরে বুঝতে পেরে ঈষৎ অপ্রস্তুত হল। বলল, "আমি সকলের কথা বলি নি, ক'জনের কথা বললাম। কত আছে আরও, আমি চিনি না।"

রাস্তা এখানে সামান্য নিরিবিলি। ঘোড়ার কদম একই তালে শব্দ করছে, একই ধ্বনিতে তার গলার ঘণ্টা বাজছে। অন্ধকার ঘন করে বোনা, কুয়াশা কী গাঢ়, যেন ওদের আবৃত করে রেখেছে।

অমল বলল, "এমন জিনিস কিন্তু আমি দেখি নি কখনও। আমাদের মধুপুরাতেও বাজি পোড়ানো হয়, ননবেঙ্গলীরা বেশ পয়সা খরচ করে—কিন্তু এরকম না। এখানের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। রাজা-টাজার ব্যাপার...!" সামান্য থামল অমল। আবার বলল, "মনে থাকবে। এত সুন্দর সব! তবে ওই জোনাকির বাজিটাই বেস্ট। ওআণ্ডারফুল। কি করে হয় বলো ত?"

সামান্য চুপ করে থেকে ভ্রমর বলল, "কি জানি! যারা বাজি তৈরী করে তারাই জানে।"

"আমি তুবড়ি তৈরী করতে পারি কিন্তু। ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে অনেক করেছি।"

"তুবড়ি করতে পুষ্পোরাও পারে।" ভ্রমর যেন গলা চেপে হাসল।

অমল বুঝতে পারল। মুখ ফিরিয়ে ভ্রমরকে দেখল, বলল, "ঠাট্টা করছ?"

"ঠাট্টা না; সত্যি সত্যি বললাম।"

গাড়িটা এবার শহরের এলাকায় এল। মনে হল, হঠাৎ যেন চোখের সামনে আড়াল সরে গেছে। অন্ধকারের মাথার চুল একরাশ আলোর চুমকির মতন দক্ষিণের দিকটা বিন্দু-বিন্দু আলোয় ঝিকমিক করছিল। অমল তাকিয়ে থাকল। একবার মুহূর্তের জন্যে মনে হল, গাড়িটা বোধ হয় ঘুরে ফিরে রাজ-বাড়ির পিছনের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে; পরে বুঝতে পারল, তারা শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে!

ভ্রমর পিছু সরে গদির ওপর ভাল হয়ে বসল আবার। একটু বেশী রকম জড়োসড়ো হল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সে সামান্য গড়িয়ে গিয়েছিল। অমল তার পাশে। পিছনের গদিতে তারা পা-দানির দিকে মুখ করে বসে আছে। সামনের দিকে বসে টাঙাঅলা গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের দিকটা স্বভাবতই বেশ মাটি-মুখো। বসে থাকতে-থাকতে গড়িয়ে যেতে হয় গাড়ি ছুটলে।

"আমার কি রকম লাগছে জান?" অমল আবেগভরে বলল, "ঠিক যেন কোনো মস্ত বড় রেল স্টেশনের কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তুমি দেখছ কখনও? আমি দেখেছি। অন্ধকার—একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার দিয়ে গাড়ি ছুটছে ত ছুটছেই, একরত্তি আলো নেই কোথাও, হঠাৎ এক সময় জানলা দিয়ে চোখে পড়ল দূরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে, তারপর দেখতে-দেখতে দুটো আলো হল, তিনটে হল, চারটে, ছ'টা, দশটা...বাড়তে-বাড়তে এক সময় দেখি অনেক আলো, মিটমিট করে জ্বলছে দূরে মালার মতন সাজানো...বিউটিফুল লাগে দেখতে।"

ভ্রমর রেলগাড়িতে যাবার কথা ভাবল। তার মনে পড়ল, একবার ছেলে-

বেলায় মা'র পাশে বসে কোথায় যেন যেতে-যেতে সে কয়েকটা আলো দেখেছিল, আলোগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছিল।

"আমি একবার আলেয়া দেখেছিলাম।" ভ্রমর বলল।

"আলেয়া! মার্শগ্যাস্...ওকে মার্শগ্যাস্ বলে।"

"কি?"

"এক রকম গ্যাস। জলো স্যাঁতসেতে ড্যাম্প জায়গায় এক রকম গ্যাস হয়..." অমল বলল, বলে হঠাৎ চুপ করে গেল, শহরের আলোকমালা কুয়াশার ঝাপসা থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে তার দু-চোখের সবটুকু আগ্রহ কেড়ে নিল।

ভ্রমর আবার রেলগাড়ির কথা ভাবল। মা মারা যাবার পর সে অনেকবার রেলগাড়িতে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনো বড় স্টেশনে গাড়ি ঢুকতে দেখে নি। হয়ত সে ঘুমিয়ে থাকত, হয়ত তার জন্যে জানলার দিকের আসন থাকত না। কিংবা খেয়াল করে সে কোনোদিন দেখে নি।

"এরা কিসের বাতি জ্বালায়?" অমল আচমকা শুধলো, "আমাদের মতন তেলের, না মোমবাতির?"

"মোমবাতিই বেশী। কেউ কেউ বাদাম তেল দিয়েও দিয়া জ্বালায়।"

"রাজবাড়িতে ইলেকট্রিক জ্বালিয়েছিল।"

"বড়লোকরা জ্বালায়।"

"তোমরাও বাতি জ্বালাতে পারতে..." অমল হঠাৎ বলল, "সবাই যখন জ্বালায়।"

"আমরা!" ভ্রমর কেমন ইতস্তত করল, চুপ করে থাকল খানিক; শেষে বলল, "মা ভালবাসে না।"

অমল মুখ ফিরিয়ে ভ্রমরকে দেখবার চেষ্টা করল। অন্ধকারে মুখটা ছায়া-ছায়া হয়ে আছে, নাক মুখ চোখ কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট করে, ধূসর ছবির মতনই দেখাচ্ছে ওকে।

টমটমের কোচোআন পায়ে করে এ-সময় ঘণ্টি বাজালো। ধাতব মধুর ধ্বনি এই নির্জনে শব্দতরঙ্গ হয়ে ভাসছিল। মনে হল, ছুটন্ত ঘোড়াটা যেন আরও জোর কদম ফেলছে। গাড়িটা থেমে-আসা-দোলনার মতন দুলছিল। সামনের দিকে, চাকার ওপরে গাড়ির গা লাগিয়ে দুপাশে দুটি বাতি জ্বলছে। অতি মৃদু একটু আলোর আভা ভ্রমরের মাথার দিকে মাখানো আছে, কেমন একটা ছায়া ছুটছে রাস্তা ধরে।

অমলের শীত ধরেছিল এবার। সত্য বেশ হিম পড়ছে। গলা নাক চুলকে এখন কেমন জ্বালা-জ্বালা লাগছে। নাক টানল আবার অমল। আকাশভরা অমাবস্যা, তারা ফুটে আছে, কুয়াশার গুঁড়ো গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

"বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।" অমল বলল, "সর্দি ধরে গেল।"

ভ্রমর আরও একটু স্কার্ফ দিল অমলের কোল ঘেঁষে, হাত ঢেকে বসতে বলল মৃদু গলায়।

"তোমার শীত করছে না?" অমল শুধলো।

"করছে।"

"আমার হাত দুটো কনকন করছে। তোমার দেখি—" অমল হাত বাড়িয়ে ভ্রমরের একটি হাত ছুঁয়ে দেখতে গেল। দেখে অবাক হল। "তোমার হাত

গরম কেন?"

"এই রকমই।"

অমল মনে করতে পারল না ভ্রমরকে নিয়ে রাজ-ময়দান থেকে বেরোবার সময় ওর হাত এত গরম লেগেছিল কি না! বোধ হয় লেগেছিল, তেমন খেয়াল করে নি। ভ্রমরের হাতের উল্টো পিঠ এবং মণিবন্ধ স্পর্শ করে অমল সঠিক ভাবে এই উষ্ণতার অর্থ বোঝার চেষ্টা করল।

"তোমার জ্বর হয়েছে, ভ্রমর। হাত বেশ গরম।"

"না, জ্বর নয়—" ভ্রমর তাড়াতাড়ি বাধা দিল, "আমার এই রকমই হয়।"

"দেখি, তোমার কপাল দেখি—" অমল ভ্রমরের কপাল দেখার জন্যে হাত বাড়াল।

জ্বর যে তাতে আর সন্দেহ হল না অমলের। জ্বর না হলে মানুষের গা এমন গরম হয় না। অমলের মনে হল, তার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় ভ্রমর যেন শীতে কেঁপে উঠল, জড়োসড়ো হল আরও।

খুব অন্যায় করেছে ভ্রমর। অমল সামান্য উদ্বেগ বোধ করল। জ্বর গায়ে নিয়ে ঠাণ্ডায় হিমে বসে বসে বাজি পোড়ানো দেখল এতক্ষণ! কী রকম বোকা মেয়ে!

"দেওয়ালি দেখে দরকার নেই, বাড়ি ফিরে যাই।" অমল বলল, "টাঙাঅলাকে বাড়ি ফিরতে বলো।"

ভ্রমর বুঝি কুণ্ঠিত হল। "দেওয়ালি দেখবে না?"

"না, আর না।"

"খানিকটা দেখে যাও।"

"আমারও শীত করছে।" বলতে-বলতে অমল তার কোল থেকে স্কার্ফটুকু উঠিয়ে ভ্রমরের কোলে ঠেলে দিল। "গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নাও। তুমি একেবারে যা তা! এইভাবে জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা লাগায়!"

শহরের মধ্যে গাড়ি এসে পড়েছিল। আলোয় আলো হয়ে আছে সামনেটা। কলরব ও উৎসবের গুঞ্জন কানে আসছিল। আকাশে হাউই উঠে তারা ফুল খসে পড়ছে। বোমা ফাটানোর শব্দ ভেসে আসছিল।

"কই, টাঙাঅলাকে বললে না কিছু?" অমল তাগাদা দিল।

ভ্রমর হিন্দীতে টাঙাঅলাকে পুবের পথ ধরে যেতে বলল। শহরের পাশ কাটিয়ে গেলে রাস্তা অল্প।

উদ্ভাসিত উজ্জ্বল ও উৎসবমুখর শহরটিকে পাশে রেখে টাঙা নিরিবিলি পথ ধরে এগিয়ে চলল।

"বাড়ি গিয়ে আমার জ্বরের কথা বলো না।" ভ্রমর বললে চাপা গলায়।

অমল অবাক হল। "কেন? জ্বর হলে কি তুমি লুকিয়ে রাখো?"

"সব সময় বলি না। মা পছন্দ করে না।"

"বাঃ! অসুখের আবার পছন্দ কি—?"

"কি জানি। মা আমার অসুখ শুনলে রাগ করে।" ভ্রমর যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে বলছিল, কথাগুলো অস্পষ্ট ও অতি মৃদু শোনাচ্ছিল।

ভ্রমরকে যেন বোঝবার চেষ্টা করছে অমল, অপলকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল। এই রাস্তাটা নিতান্ত অন্ধকার নয়, বাতি আছে ঘন-ঘন, কাছাকাছি-

বাড়ি থেকেও আলো এসে পড়ছিল। বাতাস বইছে এলোমেলো, আলোকসজ্জিত গৃহগুলির আলোর শিখা কাঁপছে।

"তোমার কি প্রায় অসুখ করে?" অমল শুধলো।

"করে। আগে করত না; আজকাল মাঝে-মাঝেই করে।"

"কি অসুখ?"

"কে জানে কি অসুখ?"

"ডাক্তার দেখাও না?"

"বেশী হলে দেখাই। বাবা বলেছিল আমায় জব্বলপুরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাবে।"

"জব্বলপুর কত দূর?"

"অনেকটা। আমি জানি না। একশো মাইল দেড়শো মাইল হবে..."

"জব্বলপুরে মণ্টুমামা থাকে।"

"তোমার মামা?"

"না, আমার কাকিমার ভাই। আমি একবার দেখেছি; আমাদের ওখানে গিয়েছিল, খুব মজার লোক।"

মামার কথা ভ্রমরেরও মনে পড়ল। মা মারা যাবার পর একবার মামা এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। জায়গাটার নাম মনে করতে পারল না ভ্রমর। চক্রধরপুর থেকে কিছুটা যেতে হয়। তখন ভ্রমর ছ'বছর কিংবা সাত বছরের মধ্যে। মামার মুখও মনে পড়ে না। মাথার মাঝখানে সিঁথি ছিল, গোঁফ ছিল, বুক পকেটে ঘড়ি থাকত। মামা রেলগাড়িতে উঠে লাল নীল ফ্ল্যাগ ওড়াত, হুইশল্ বাজাত। মামার কাছে এক-দেড় বছর ছিল ভ্রমর। তারপর মামা রেলে কাটা পড়াতে বাবা তাকে নিয়ে এল আবার।

বাবার কাছে ফিরে এসে ভ্রমর দেখল, বাড়িতে দুজন মানুষ; হিমানী-মা আর কৃষ্ণা। বাবা যে হিমানী-মাকে বিয়ে করেছে ভ্রমর বাড়ি এসেই বুঝতে পেরেছিল। কৃষ্ণা তার বাবাকে বাবা বলত, হিমানী-মাকে মা বলত দেখেই ভ্রমর সব বুঝতে পেরেছিল। শুধু বুঝতে পারে নি কৃষ্ণা কি করে হিমানী-মা'র সঙ্গে এল।

পরে সবই বুঝতে শিখল ভ্রমর। তখন তারা যেখানে থাকত সেখানে ভ্রমরের মা'র এক বন্ধু ছিল। মাদ্রাজী বন্ধু। নাম ছিল দেবকী। কৃশ্চান সোসাইটির বাড়িতেই থাকত সিস্টার। দেবকীর কাছ থেকে ভ্রমর অল্পে-অল্পে জানতে পেরেছিল, হিমানী-মা কৃষ্ণাকে সঙ্গে করে এনেছে, কৃষ্ণার বাবা নেই, হিমানী-মা'র স্বামী মারা গেছে দু-বছর আগে। দেবকী সিস্টার তারপর ভ্রমরকে কোলের ওপর বসিয়ে অনেক করে বুঝিয়েছিল নানারকম কথা, বলেছিল: লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে বলেই বলছি ভ্রমর: তোমার মা-বাবার বিচার তুমি করো না: পরের বিচার করতে নেই। যীশু আমাদের কি বলেছেন জানো ত! আচ্ছা, বলছি তোমায়...। প্রভু বলেছেন, পরের বিচার করবার আগে নিজের কথা ভেবো। তোমার নিজের চোখে কুটো, তুমি পরের চোখের কুটো তুলতে যেও না।

ভ্রমরের তখন অত কথা বোঝার বয়স নয়, তবু সে খানিকটা বুঝেছিল। কিন্তু তার মনে হত, বাবা ভাল কাজ করে নি। তার দুঃখ হত। সে ভাবত,

হিমানী-মা এবং কৃষ্ণাকে আমি ভালবাসব। আর বাবাকেও ভালবাসব। কৃষ্ণার বাবা নেই এই দুঃখও সে অনুভব করত কখনও কখনও।

তারপর আজ কত বছর কেটে গেল। ভ্রমর তখন সাত কি আট বছরের ছিল, কৃষ্ণা চার বছরের, এখন ভ্রমর সতেরো বছরের মেয়ে, কৃষ্ণাও কত বড় হয়ে গেছে, বাবা রায়পুরে ছিল চার বছর, সেখান থেকে এখানের কলেজে চলে এল, হিমানী-মা'র মাথার চুল পেকে উঠল, কত দিন কেটে গেল, তবু ভ্রমর কেন ওদের তেমন করে ভালবাসতে পারল না!

"ভ্রমর, এবার আমি রাস্তা চিনতে পেরেছি।" অমল বলল।

ভ্রমর অন্যমনস্ক ছিল, শুনতে পায় নি। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অমলের দিকে।

অমল হাত তুলে বাঁ দিকের মস্ত বাড়িটা দেখাল। বলল, "ওই ত কলেজ, কিছুটা এগিয়ে ডান হাতি রাস্তা ধরলে বাড়ি—। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ।" ভ্রমর মাথা নাড়ল আস্তে করে। তার কাঁপুনি লাগছিল খুব। শীত করছিল। চোখ করকর করছে। নিশ্বাসও গরম। আজ আবার তার জ্বর এল।

কলেজ পেরিয়ে এল টাঙাটা। রাস্তায় কারা যেন পোড়া ফানুস ফেলে চলে গেছে, তখনও জ্বলছিল। কিংবা ফানুসটা উড়তে-উড়তে আগুন ধরে গিয়ে এখানে এসে পড়েছে। কোচোআন ঘোড়ার লাগাম টান করে মোড় ঘুরে ডান হাতি পথ ধরল।

ভ্রমর বুকের কাছে স্কার্ফ জড়িয়ে যখন কাঁপুনি সইছিল তখন হঠাৎ কেমন অস্ফুট শব্দ করল।

অমল মুখ ফিরিয়ে তাকাল। "কি হল?"

ভ্রমর গলা আর বুকের কাছটায় কি যেন খুঁজছিল।

"কি হয়েছে?" অমল আবার শুধলো।

লকেটটা পাচ্ছি না।" ভ্রমর উদ্বিগ্ন ও ভীত গলায় বলল।

"পাচ্ছ না? হারের লকেট?"

ভ্রমর বুঝতে পারছিল না তার গলার হার থেকে সোনার ক্রুশটা কেমন করে কখন খুলে পড়ল? বড় ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ভ্রমর।

"লকেটটা কি আলগা ছিল?" অমলও ব্যস্ত হল একটু।

"ঢিলে ঢিলে ছিল।"

"তবে জামাকাপড়ের মধ্যে পড়েছে কোথাও। নামবার সময় খুঁজে দেখব।"

ভ্রমর তখনও লকেট খুঁজছিল। খুঁজতে-খুঁজতে চাপা গলায় বলল, "মাকে বলো না। হারিয়ে গেছে শুনলে আমায় বকবে।"

বাড়ির গেটের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

২

ভ্রমর ডাকছে শুনে অমল চোখ মেলে তাকাল। তার ঘুম ভাঙল; দেখল, রোদ এসে ঘর ভরে গেছে, একটা চড়ুইপাখি ঘরময় ফরফর করে উড়ছে। ভেতর দিকের জানলার ওপাশে পরদা-ঘেঁষে ভ্রমরের মুখ দেখা গেল না। ঘরের দরজা বন্ধ; বাইরের দিকের উত্তরের জানলাটাও খোলা নয়। পুবের জানলার শার্সি একপাট ভেজানো, অন্য পাট খোলা; রোদ আসছে গলগল করে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে, অমল বুঝতে পারল। অন্য দিন ভ্রমর তাকে রোদ ওঠার সময় জাগিয়ে দেয়। আজ কি ভ্রমর তাকে ডাকতে বেলা করল, নাকি অনেকবার এসে ডাকাডাকি করেছে, অমল উঠছে না দেখে চলে গেছে শেষ পর্যন্ত? অমল সঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারল না। তার মনে হল, ভ্রমর অত তাড়াতাড়ি চলে যায় না, অমল জেগে উঠলে জানলার ও-পাশে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে অমল ভাবল, সে ঘুমের মধ্যে ভ্রমরকে ডাকতে শুনেছে। আজ ভ্রমর তাকে ডাকতে আসে নি; জ্বর গায়ে বেচারী হয়ত এখনও বিছানায় শুয়ে আছে।

শার্ট গায়ে গলিয়ে পুরোহাতা পুলওভারটা পরে নিল অমল। বেশ ঠাণ্ডা। কালকের হিম খেয়ে সামান্য সর্দি মতন হয়েছে। উত্তরের জানলাটা অমল খুলে দিল, হিমভেজা শীতল বাতাসের স্পর্শ তার ভাল লাগল, দু-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে এই সকালের ঠাণ্ডাটুকু মুখেচোখে মেখে নিল।

বাথরুমে যাবার সময় অমল অর্গানের শব্দ শুনতে পেল; বসবার ঘরে বসে কেউ অর্গান বাজাচ্ছে। নানা পথ ঘুরে অনুচ্চ ভাঙা-ভাঙা সুর ভেসে আসছে করিডোরে। হিমানীমাসিমা, ভ্রমর না কৃষ্ণা কে যে সকালবেলায় অর্গানে গিয়ে বসেছে অমল বুঝতে পারল না। যদি ভ্রমর হয়, অমল ভাবল, তবে তার শরীর ভাল আছে।

কাল বাড়ি ফেরার পর ভ্রমরের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। ভ্রমর সোজা নিজের ঘরে শুতে চলে গিয়েছিল। রাত্রে খাবার সময়ও সে আসে নি। কৃষ্ণা বলল, মাথা ধরেছে ভ্রমরের। শুনে আনন্দমেসোমশাই বললেন, বাজি পোড়ানোর বারুদের গন্ধে বড় মাথা ধরে। অমল কিছু বলে নি; ভ্রমর তাকে যা-যা বলেছিল, জ্বর হবার কথা না-বলা, লকেট হারানোর কথা না-জানানো—সব নিষেধই মেনেছে। লকেটটা কি সত্যিই হারিয়ে গেল? কি করে হারাল, আশ্চর্য! ভ্রমর যদি জামার মধ্যে লকেটটা পেয়ে গিয়ে থাকে তবেই রক্ষে—নয়ত তাকে বকুনি শুনতে হবে। ভ্রমর লকেটটা পেয়েছে কিনা জানতে ইচ্ছে হল অমলের। দেখা

না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই জানতে পারবে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে আসার সময় অমল অর্গানের শব্দ আর শুনতে পেল না। সমস্ত বাড়ি সহসা খুব নিঃশব্দ হয়ে গেছে। করিডোর ছায়ায় ভরা; সামনের বাঁ দিকের ঘরে মোটা পরদা দুলছে। ও-ঘরে ভ্রমররা থাকে, ঘরে ভ্রমর আছে কিনা বোঝা গেল না। কোনো সাড়া শব্দ নেই কোথাও।

ঘরে এসে অমল মুখ মুছল, চুল আঁচড়ে নিল। মাথার ওপর এখন দুটো চড়ুইপাখি ভেণ্টিলেটারের গর্তে বসে কিচমিচ করছে। বিছানার ওপর কুটো ফেলছে চড়ুই দুটো। অমল ঘর ছেড়ে চলে গেলে হয়ত ওরা আবার কুটোটা কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। আজ ক'দিন ধরে এই ঘরে ওরা একটা বাসা বাঁধার চেষ্টা করছে।

পাজামা সামান্য ঠিক করে নিল অমল। হাত-ঘড়িটা তুলে নিয়ে বেলা দেখল। ইস্, আটটা প্রায় বাজে। কাল একেবারে মরার মত ঘুমিয়েছে। ঘড়িতে দম দিতে-দিতে অমল চায়ের জন্যে খাবারঘরের দিকে চলে গেল।

বেশ বেলা হয়ে যাওয়ায় খাবার টেবিল থেকে চায়ের ব্যবস্থা তুলে ফেলা হয়েছিল। ঘরে কেউ ছিল না। অমল কি করবে, কাকে ডাকবে ভাবছিল, এমন সময় হিমানীমাসির পায়ের শব্দ পেল।

হিমানী ঘরে এলেন। তাঁর গায়ে মেটে লাল রঙের গরম চাদর। পায়ের দিকে মাটি লেগেছে শাড়িতে। মিলের সরু পাড়অলা সাদা শাড়ি বা চিকনের সাদা শাড়ি ছাড়া হিমানীমাসিকে আর কিছু পরতে দেখে না অমল। বাইরে বেরুবার সময় সিল্ক পরেন, হয় পাড়ে সরু কাজ করা সাদা সিল্ক, না হয় খুব নরম রঙের ছাপা কোন শাড়ি। ওঁর রঙ আধ-ফরসা, বেশ মোটাসোটা চেহারা; মুখের গড়নটি গোল। মোটা চাপা নাক, ঠোঁটেরও খুঁত আছে, ওপর ঠোঁটের ডানদিকে সামান্য কাটা দাগ। হিমানীমাসির মাথার পাশের চুলগুলি সাদা হয়ে এসেছে। সিঁদুর নেই মাথায়। অমলের প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লেগেছিল। ওঁর চোখে চশমা থাকে সর্বক্ষণ, তবু অমল তাঁর গোল নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে পারে, হিমানীমাসি বেশ শক্ত স্বভাবের মানুষ। বড় গম্ভীর, বেশী কথা বলেন না।

অমল চায়ের জন্যে খাবার-টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিল; হিমানী বললেন, "তুমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসো, কৃষ্ণা চায়ের জল নিয়ে যাচ্ছে।"

হিমানীমাসি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বা বিরক্ত হয়েছেন এমন কিছু বোঝা গেল না। তবু নিজের কাছে নিজেই যেন একটু লজ্জা পেল অমল; বলল, "ঘুম ভাঙতে বড় দেরী হয়ে গেল আজ।"

হিমানী খাবারঘরের একপাশে চলে গিয়ে বড় মতন র‍্যাকে হাত দিলেন, বললেন, "সকালে উঠে বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে।"

অমল আর কিছু বলল না। এই ঘর তার বড় স্যাঁতসেঁতে লাগছিল। আলো প্রায় নেই, রোদও ঢোকে না। বারান্দায় গিয়ে রোদে বসার জন্যে সে উঠে পড়ল।

বারান্দায় যাবার সময় অমল বসার ঘরের মধ্যে দিয়ে গেল। দেখল, অর্গানের ঢাকনা বন্ধ, ঘরে কেউ নেই। দরজা জানলায় নেটের কাজ-করা সুন্দর পরদা; পাতলা আলো আসছে ঘরে, ছায়া জমে আছে হালকা। ডানদিকে ড্রয়ার,

ড্রয়ারের মাথায় র‍্যাক, ফুল তোলা, র‍্যাকের ওপর লেসের ঢাকনা, ফুলদানি ঘড়ি একটি ধূসর ফটো এবং মার্বেল পাথরের কয়েকটা টুকটাক খেলনা সাজানো। ঘড়ির শব্দটা হঠাৎ যেন কানে গেল। ঘরের প্রত্যেকটি জানলার খড়খড়ি খোলা, শার্সি গুটানো; পরদাগুলো পরিচ্ছন্নভাবে টাঙানো রয়েছে। মধুর মৃদু এক গন্ধ আছে বাতাসে। বোধহয় ধূপ জ্বালানো হয়েছিল। বেতের সোফায় ভ্রমরের বেড়াল গা গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে। সামনের দেওয়ালে দরজার মাথায় মেহগনি কাঠের সুন্দর যীশুমূর্তি, ক্রুশবিদ্ধ যীশু। এই মূর্তিটির পায়ের তলায় স্কাইলাইটের আলো এসে পড়েছে। এবং আলোর কাছে দেওয়ালে গাঁথা ফুলের ডাঁটার মত দুটি পেতলের মোমদান।

মাথা ঘুরিয়ে অমল দেওয়ালের অন্য পাশে মেরীর বাঁধানো বড় ছবিটাও দেখল, কি মনে করে কাঁচের পাল্লা দেওয়া ছোট্ট শো-কেসের মধ্যে একটি রুপোর ক্রুশ, চিনেমাটির খেলনা ও কয়েকটি নকশা-করা সামগ্রী দেখল। মাথার ওপর চিনেমাটির ফুলদানি। ফুলদানিতে বাসীফুল তার চোখে পড়ল না। হিমানীমাসি ফুল বদলে দিয়েছেন।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল অমল। ঘরদোরের ঝাপসা আলো থেকে বাইরে এসে তার চোখ মুহূর্তের জন্য যেন অত আলো সহ্য করতে পারল না। সে পলক ফেলল। অমল দেখল, সকালের রোদে সামনের সমস্ত কিছু ভেসে যাচ্ছে। বেলা হয়ে এসেছে বলে রোদ গাঢ় হয়ে আসছে, আলো বেশ ঘন এবং ঝকঝকে। সামনের বাগানের ফুলপাতার গায়ে রাতের হিম শুকিয়ে এল। সবুজ রঙটি বেশ উজ্জ্বল ও নির্মল। ফুলগুলি অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। অমল এগিয়ে রোদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

জায়গাটা বাস্তবিকই খুব সুন্দর। তাদের বিহার, বিশেষ করে সে যেখানে থাকে, মধুপুরা এতটা সুন্দর নয়। ছোটনাগপুরে অনেক ভাল ভাল জায়গা আছে, লোকজন বেড়াতে আসে, অমল নিজেও রাঁচি-টাচি গিয়েছে, গিরিডিতে থেকেছে, তবু তার কাছে সি পি-র এই জায়গাটা আরও সুন্দর ও শুকনো লাগছে।

এখানে ভিড় ঘিঞ্জি হই-হই একেবারেই নেই, রাশি রাশি আড়ৎ, গুদোম, মাল-লরির বস্তা নামানো ওঠানো, অফিস কাছারি চোখে পড়ে না। খুব ছিম-ছাম, পরিষ্কার। এসে পর্যন্ত সে মাছি অথবা মশার উৎপাত দেখতে পেল না। এখানকার মাটি এবং গাছপালার চেহারাও কেমন আলাদা। শক্ত আঁট সামান্য কালচে মাটি, কখনও কখনও পাথর মেশানো, তা বলে রুক্ষ চেহারা নয়। ধারেগাটা পাহাড়ী। দেবদারু গাছ অজস্র। শিরীষ এবং ঝাউ গাছও অনেক, শাল গাছও আছে। আরও অনেক গাছ দেখেছে অমল--নাম জানে না। তার সবচেয়ে সুন্দর লাগে ওই গাছগুলো দেখতে--কৃষ্ণচূড়ার মতন পাতা, সেই রকমই ডালপালা অনেকটা, তবে অনেক উঁচু আর ছাতার মতন মাথাটা ছড়ানো। ঝুরির মতন লম্বা-লম্বা ডাঁটি ধরে, যা নাকি ফল নয়, ফুল। ফুলই হবে, কেননা পাতলা ডাঁটির গায়ে আলতা রঙের আঁশ-আঁশ সুতো জড়িয়ে থাকে। ভ্রমর বলছিল, সারা শীতকাল এখন ওই ফুল ফুটবে, বসন্তের শেষে সব ঝরে যাবে।

বারান্দার ওপর থেকে লাফ মেরে অমল বাগানে নেমে পড়ল। সবুজ ঘাস

রোদের আভায় মসৃণ ও মোলায়েম দেখাচ্ছে। গাঢ় হলুদ গাঁদা ফুল ফুটেছে একপাশে, গোল-মতন কেয়ারি করা জায়গাটায় গোলাপ ঝাড়, অন্য পাশে মরসুমী ফুলের চৌকোনো খানিকটা জায়গা। গোলাপফুল ফুটে আছে কয়েকটা; শীতের বাতাস পেয়ে মরসুমী ফুলগুলি থোকা-থোকা ফুটে উঠছে। সাদা আর বেগুনী রঙ মেশানো জুঁই ফুলের মতন ফুলগুলোকে কি যেন বলে ভ্রমররা। নামটা মনে থাকে না। আর একটা ফুল, খইয়ের মতন ধবধবে সাদা আর ছোট-ছোট, গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুটে থাকে, তাকে এরা বলে ডিউ-ড্রপস্।

এই বাগানে অমলের খুব পরিচিত কয়েকটা গাছ রয়েছে, নয়ত সে বোকা হয়ে যেত। তার মনে হতে পারত, জায়গাটা বুঝি বিদেশ। যেমন ওই কুল-গাছ, কুলগাছটা ভরতি হয়ে ফুল ধরেছে। কুলতলার দিকে একেবারে সাদামাটা করবী গাছ কয়েকটা। কৃষ্ণা একটা দোলনা টাঙিয়ে রেখেছে ওদিকে—শিরীষ গাছের ডালে।

অমল পায়চারি করতে-করতে দোলনার কাছেই যাচ্ছিল, ডাক শুনে ফিরে তাকাল। কৃষ্ণা ডাকছে।

অমল বারান্দার দিকে ফিরল।

বেতের গোল টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে কৃষ্ণা চেয়ারে বসে আছে। অমল অন্য একটা চেয়ার টেনে বসল।

"ওকি, তোমার মুখে কিসের দাগ ওটা?" অমল কৃষ্ণার ডান গালে কাল-শিরে পড়ে যাওয়ার মতন দাগ দেখে বলল।

সুজির প্লেট এগিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণা, দিয়ে ডিমের ওমলেটে গোলমরিচ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বলল, "কীট কেটেছে।"

"কীট?" অমল প্রথমটায় কেমন বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। বুঝে হেসে ফেলল। "পোকা কামড়েছে?"

কৃষ্ণা মাথা নাড়ল। কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বলল, "রাতে কেটেছে কাল। দেওয়ালিতে কি পলা পোকা হয়। ডোরা ডোরা দেখতে।"

অমল মজা পাচ্ছিল। কৃষ্ণার কথা বলার ধরনটাই এইরকম, আধেক হিন্দী মেশানো বাঙলা কথা বলবে। এ-বাড়ির সকলেই দু-পাঁচটা এইরকম কথা বলে, কিন্তু কৃষ্ণা যেন বড় বেশী বলে। তার কারণ, কৃষ্ণার বন্ধুবান্ধবরা সকলেই প্রায় অবাঙালী। সে যে-স্কুলে পড়ে সেখানে নাকি মাথাগোনা বাঙালী মেয়ে। দিনের পর দিন এদিকে থাকতে-থাকতে, এদের সঙ্গে মিশতে-মিশতে এইরকম হয়ে গেছে কৃষ্ণা।

"ওষুধ দিয়েছ?" অমল সুজি খেতে-খেতে শুধলো।

"ডেটল লাগিয়েছি।"

"আমার কাছে অয়েণ্টমেণ্ট আছে। ভাল অয়েণ্টমেণ্ট। লাগিয়ে দিও, তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।"

কৃষ্ণা চায়ে দুধ চিনি মিশিয়ে এগিয়ে দিল। দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার বারান্দাটা দেখে নিল। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে হাসল, যেন কোনো অপরাধ করার আগে বলে নিচ্ছে। বলল, "আমি আধা কাপ খাই।"

"আধা কেন, পুরো কাপ খাও। চা কি কম আছে?"

"না।" কৃষ্ণা মাথা নাড়ল। "মা দেখলে চিল্লাচিল্লি করবে। সকালে খেয়েছি

কিনা?"

অমল হেসে ফেলল। হিমানীমাসির কাছে প্রশ্রয় নেই বে-নিয়মের। সকালে চায়ের টেবিলের পাট চুকলে দ্বিতীয়বার চা পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণা অন্য পেয়ালায় চা ঢেলে নিল অর্ধেকটা। সতর্ক চোখে বারান্দাটা আরও একবার দেখে নিল।

"তুমি খাও, আমি গার্ড দিচ্ছি।" অমল হেসে বলল।

চায়ের কাপ ঠোঁটে তুলল কৃষ্ণা। অমল হাসিমুখে ওকে দেখছিল। হিমানী-মাসির মতনই মুখের গড়ন অনেকটা, তবে কৃষ্ণার চোখ দুটি পরিষ্কার। মোটা ভুরু, বড় বড় চোখ। গোলগাল চেহারা। রঙ কালো। অমল দেখেছে কৃষ্ণা শাড়ি পরে না। স্কার্ট ব্লাউজ, না হয় এদেশী মেয়েদের মতন কামিজ আর পা-আঁটো পাজামা; মাথার মাঝখানে সিঁথি করে দুপাশে দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে রাখে।

"মেসোমশাই কোথায়?" অমল শুধলো।

কৃষ্ণা গায়ের গরম জামায় আলতো করে তার চিবুক ঘষে নিল। "শহরে গেছে।"

শহরে গেছেন? অমলের কেন যেন অন্য রকম মনে হল। এখন তাঁর শহরে যাবার কথা নয়। সকালের এ-সময়টা হয় তিনি বাগানের পরিচর্যা করেন, নয় বই-টই পড়েন। কলেজের জন্যে তৈরী হন। ভ্রমরের চিন্তাটাই সহসা অমলকে আবার উদ্বিগ্ন করল।

অমল বলল, "ভ্রমর কই? তাকে দেখছি না সকাল থেকে?"

"শুয়ে আছে। জ্বর।"

"জ্বর!"

"ওর হরদম বিমার হয়।" কৃষ্ণা গা করল না যেন। ভ্রমরের জ্বরজ্বালা সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই।

"কতো জ্বর? খুব বেশী?" অমল জিজ্ঞেস করল।

কৃষ্ণা বলতে পারল না। সে জানে না কতটা জ্বর। সকালে ভ্রমর আগে ওঠে। আজ সে ঘুমোচ্ছিল। কৃষ্ণা উঠে ভ্রমরকে ডাকতে গিয়ে দেখল, লেপের মধ্যে মুখ ঢেকে কুঁকড়ে ভ্রমর ঘুমোচ্ছে; ভ্রমর উঠল না; বলল, তার জ্বর হয়েছে।

অমলের খুব খারাপ লাগল। এ-বাড়ির কেউ ভ্রমরের অসুখ-বিসুখ চেয়ে দেখে না; গ্রাহ্য করে না যেন। মাসিমা অমলকে ভ্রমরের অসুখের কথা কিছু বললেন না। ভ্রমর ঠিকই বলেছিল, তার অসুখ শুনলে এরা সবাই অসন্তুষ্ট হয়।

চা খেতে-খেতে অমল এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, আজ ভ্রমর তাকে সকালে উঠিয়ে দিতে আসে নি, ভ্রমর বিছানায় শুয়ে আছে বলে কৃষ্ণা তাকে চা করে দিতে এসেছে।

চোখ তুলে কৃষ্ণাকে দেখতে-দেখতে অমল ভাবল, ভ্রমর লকেটটা ফিরে পেয়েছে কিনা কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করবে নাকি? সামান্য ভাবল। মনে হল, থাক, জিজ্ঞেস না করাই ভাল; কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে ভ্রমর অসুবিধেয় পড়বে।

মেসোমশাই শহরে ডাক্তারকে খবর দিতে গেছেন বলেই অমলের মনে হল। বলল, "মেসোমশাই ডাক্তারকে খবর দিতে গেছেন?"

"না।" কৃষ্ণা মাথা নাড়ল। সে জানে না; তেমন কোনো কথা সে শোনে নি।

এমন সময় বাগানের দিকে কাঠের ফটক খুলে লীলা এল। কৃষ্ণার বন্ধু। লেডিজ বাইসাইকেল-এ চেপে এসেছে। একটা পাক খেয়ে পলকে বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। বেল বাজাতে-বাজাতে ডাকল কৃষ্ণাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে কৃষ্ণা যেন ছুটে সিঁড়ির কাছে চলে গেল। অমল লীলাকে চেনে—প্রায় রোজই সে এ-বাড়িতে কৃষ্ণাকে ডাকতে আসে, কৃষ্ণার বন্ধু। অত্যন্ত চঞ্চল সপ্রতিভ মেয়ে। দোলনায় যখন দোলে মনে হয় দড়ি ছিঁড়ে শূন্যে থেকে ছিটকে পড়বে; সাইকেল চালায় এত জোরে যে ভয় হয় হুড়মুড় করে কারো গায়ে গিয়ে পড়ল বুঝি। মেয়েটা নাকি দু-বার হাত ভেঙেছে। একদিন অমল ওর সংগে ব্যাডমিণ্টন খেলেছিল। বেশ ভাল খেলে লীলা। কৃষ্ণাদের স্কুলের প্লেয়ার।

লীলারা কাছেই থাকে। এ-বাড়ির পরের পরেরটায়। ওরা বুঝি দিল্লির লোক। লীলার বাবা এখানকার কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। মেসোমশাই বলেন, এবার প্রিন্সিপ্যাল হবে, খুব কাজের লোক।

কৃষ্ণা এবং লীলা দুজনে কি বলাবলি করল। তারপর কৃষ্ণা বারান্দার দিকে ফিরল, তরতর করে চলে গেল। লীলা বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল, ভাইজী নমস্তে। বলে হাসল। অমলও হাসল। সামান্য পরেই কৃষ্ণাকে ঘর থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল অমল।

তারপর দুই বন্ধু সাইকেলে চেপে চোখের পলকে উধাও। কয়েকটা পাখি ছিল বাগানে। একে অন্যের ডানায় ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর দিচ্ছিল, খাবারের দানা খুঁটে নিচ্ছিল মুখ থেকে। তারা কেউ গাঁদাফুলের ঝোপের দিকে চলে গেল, কেউ উড়ে কলাগাছের পাতার আড়ালে গিয়ে বসল। কাক ডাকছিল কোথাও। অমলের হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ল। মাকে চিঠি লিখতে হবে আজ। বউদিকেও চিঠি দিতে হবে। আসবার সময় বউদি বলেছিল, তোমার ভাল লাগবে না ও-সব জায়গা, দু-দিন পরেই পালিয়ে আসবে; তার চেয়ে বেনারসে দিদিমণির কাছে যাও, দু-মাস তবু থাকতে পারবে। বউদিকে লিখতে হবে, এই জায়গাটা অমলের খুব ভাল লাগছে। দু-মাস সে এখানে অনায়াসে থাকতে পারবে। শরীর সেরে গেলে ফেরার সময় অমল জব্বলপুর যাবে, মণ্টুমামার কাছে ক'দিন থাকবে, তারপর বাড়ি ফিরবে। ততদিনে জানুআরি মাস পড়ে যাবে। মার্চ এপ্রিল থেকে অমলের আবার তোড়জোড় শুরু, রেলের মেকানিক্যাল ওআর্কশপে তিন বছর ট্রেনিং নিতে হবে। বাবা বলেছেন, ভাল করে কোর্সটা শেষ করতে পারলে প্রসপেক্ট রয়েছে। অমলের ইচ্ছে, বাবার মতন সেও রেলের চাকরিতে থাকে, বাবার মতন অফিসার হয় একদিন।

বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে অমল মুখ ফেরাল। হিমানীমাসি। তাঁর পিছনে এ-বাড়ির আয়া, কালো বেঁটে শক্ত সমর্থ দেখতে, বিদঘুটে নাম ওর, টিসরি আব্রাহাম। ভ্রমর বলে, ওরা সব মিশনারী পুয়োর হোমের মেয়ে, কে কোথাকার লোক বোঝা যায় না, মিশনারীরা মানুষ করেছে, তারপর বড় হয়ে যে যার রুজি-রোজগার করে বেঁচে আছে।

হিমানীমাসির পিছু পিছু আয়া একরাশ কাচা কাপড় এনেছিল বালতি করে, মাসির কথামতন বাগানের ঘাসে একে-একে মেলে দিতে লাগল।

অমল উঠল। অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, ভ্রমরের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। এতক্ষণ বসে না থেকে তার ভ্রমরের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। অমল নিজের বোকামি এবং গাফিলতির জন্যে গ্লানি বোধ করল।

ভ্রমরের ঘরে এসে আস্তে করে ডাকল অমল, তারপর পরদা সরিয়ে মুখ বাড়াল।

ভ্রমর বিছানায় বসে আছে; হাঁটু গুটিয়ে মুখ ঢেকে। বড়-বড় ফুল আঁকা লেপটা তার কোমর পর্যন্ত টানা। ঘরে রোদ এসেছে পর্যাপ্ত, অনেকখানি রোদ ভ্রমরের বিছানায় ও তার পিঠে ছড়িয়ে আছে। অমল ঘরে ঢুকল। পায়ের শব্দে মুখ তুলল ভ্রমর।

সারা রাতের জ্বরে মুখ যেন পুড়ে শুকিয়ে গেছে ভ্রমরের। চোখের চার-পাশ টসটস করছিল, পাতলা ঠোঁট দুটিতে যাতনা মেশানো। ক্লান্ত অবসন্ন চোখ তুলে ভ্রমর অমলকে দেখল দু-পলক। তারপর অসুস্থ অবশ হাতে কোমর থেকে লেপ আরও একটু উঁচুতে তুলে নিল। নিয়ে কেমন বিব্রত ভঙ্গিতে এলোমেলো কাপড়টা গায়ে গুছিয়ে নিল।

অমল বিছানার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। একটা রাতে কী চেহারা হয়ে গেছে ভ্রমরের, কতদিনের কালি যেন তার মুখে গালে বসে গেছে, কপালে একরাশ উড়ো চুল, কাঁধের কাছে বিনুনি খুলে চুলগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, মাথা কান ও গলার ওপর চুলের আঁশ উড়ছে যেন।

"খুব কাণ্ড করলে! দেখতে দেখতে এত জ্বর!" অমল হালকা করে বলার চেষ্টা করল।

ভ্রমর ততক্ষণে খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছে। সামান্য আড়ষ্ট হয়ে বসে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুখ কপাল থেকে উড়ো চুলগুলো সরাতে লাগল।

ঘরে দু-পাশে দুটি লোহার স্প্রিঙ্ দেওয়া খাট। কৃষ্ণার বিছানার দিকে এগিয়ে অমল ধার ঘেঁষে বসল। বলল, "এখন কেমন আছ?"

"জ্বর আছে।" ভ্রমর বলল নীচু গলায়, মুখ না তুলে।

"কত জ্বর?"

"জানি না।"

"জ্বরটা দেখ তবে। থার্মোমিটার দাও।" অমল সরাসরি ভ্রমরের দিকে তাকিয়েছিল। বাসী এলোমেলো বিছানায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে-থাকা রুগণ কৃশ ভ্রমরের জন্যে তার বড় দুঃখ হচ্ছিল। ভ্রমরের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এখনও তার বেশ জ্বর আছে। "থার্মোমিটার নেই বাড়িতে?" অমল শুধলো। সে যেন একটু অধৈর্য হয়েছে।

"আছে। এ-ঘরে নেই।"

"কোথায় আছে বলো, আমি নিয়ে আসছি।"

ভ্রমর মুখ তুলল। তার চোখে কেমন তীব্রতা ও শঙ্কার ছায়া ভাসছিল। হয়ত কোনো কারণে সে জ্বর দেখতে চায় না। কি বলতে গেল, গলার স্বর উঠল না, ভেঙ্গে গেল। একটু অপেক্ষা করে গলা পরিষ্কার করে নিল ভ্রমর, বলল, "এখন থাক।"

"থাক্! বা রে! এখন থাকবে কেন? তুমি জ্বর দেখবে না?" অমল অবাক।

ভ্রমর ভাবল একটু। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের চুল সরাল, বলল

"এখন আমি মুখটুখ ধুতে যাব।"

অমলের ভাল লাগল না। জ্বর নিয়ে ভ্রমর এত লুকোচুরি করে কেন? কিসের ভয় তার? কেউ ইচ্ছে করে কি অসুখ বাধায়? না লুকিয়ে রাখলেই অসুখ সারে!

ভ্রমর হাই তুলল। বিছানা ছেড়ে উঠবে যেন এইবার।

লকেটের কথাটা হঠাৎ মনে হল অমলের। ভ্রমরের চোখের দিকে তাকাল, বলল, "তোমার লকেটটা পেয়েছ?"

মাথা ডান পাশে কাত করে ভ্রমর বলল, "পেয়েছি।"

অমলের কোথায় যেন একটা দুশ্চিন্তা ভাসছিল। লকেট পাবার খবর শুনে সেই দুশ্চিন্তা সরে গেল। খুশী হয়ে অমল শুধলো, "কোথায় পেলে?"

"জামার মধ্যেই।" ভ্রমর অস্পষ্ট গলায় বলল। বলে পিঠের পাশ থেকে বালিশ সরাল। তার মনে হল, মা কাছাকাছি কোথাও রয়েছে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভ্রমর অস্বস্তির গলায় বলল, "এখন মুখটুখ ধুতে যাব। তুমি..."

অমল উঠল। এই ফাঁকে সে বাড়ির চিঠিগুলো লিখে ফেলবে ভাবল। বলল, "তুমি মুখ ধুয়ে এস, আমি ঘরে গিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলি। তারপর এসে বসবো'খন।"

ভ্রমর হঠাৎ বলল, "এখন না। বিকেলে—"

"বিকেলে?" অমল কথাটা বুঝল না।

ভ্রমর ইতস্তত করে বলল, "জ্বর হয়ে শুয়ে আছি, গল্প করলে মা বকবে। বিকেলে—"

"বিকেলে জ্বর থাকবে না?" অমল হেসে ফেলল।

"মা থাকবে না।"

"কোথায় যাবেন?"

"চার্চে। আজ রবিবার না!"

অমল দু-মুহূর্ত অন্যমনস্কভাবে ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল। বুঝতে পারল, ভ্রমর আজ চার্চে যাবে না; তার জ্বর। বাড়িসুদ্ধ আর সবাই চার্চে যাবে।

অমল আর কিছু বলল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেলের রোদ থাকতে-থাকতেই হিমানীরা চলে গেলেন। চার্চ অনেকটা দূরে, মাইল পাঁচেক প্রায়। আনন্দমোহন গরম পোশাক ভেঙে পরেছেন আজ, কোটের বাটন-হোলে ফুল গুঁজেছেন; হিমানী সিল্কের হালকা-ছাপা শাড়ির ওপর গরম শাল নিয়েছেন, পাতা কেটে চুল বাঁধার মতন করেই চুল বেঁধেছেন সযত্নে। কৃষ্ণা স্কার্ট ব্লাউজ আর গরম শর্ট কোট পরেছে, জুতো মোজা, বিনুনিতে রিবন বেঁধেছে ফুল করে। টাঙা এসেছিল, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মতন—পরিচ্ছন্ন ফিটফাট হয়ে গোটা পরিবারটি চার্চে চলে গেল।

অমল বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল তখন, ইংরেজী উপন্যাস, আনন্দমোহন আনিয়ে দিয়েছেন কলেজ লাইব্রেরী থেকে। হিমানীদের চলে যেতে দেখল অমল, টাঙাটা চলে গেলে সে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ফাঁকা

চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

শীতের শেষবেলা দেখতে দেখতে মরে এল, আলো নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হল। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে পোশাক বদলে নিল অমল। গরম পুলওভারটা পরার সময় দেখল, বাইরে ছায়া জমেছে, পাতলা অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে এল।

ভ্রমর বোধ হয় অপেক্ষায় বসেছিল। অমল ঘরে ঢুকে দেখল, আয়া ঘর পরিষ্কার করে বিছানা পেতে চলে গেছে। ঘরটা মাঝারি ধরনের, দু-বোনের দুটি বিছানা দু-পাশে, পড়ার টেবিল একটা, গোটা-দুই চেয়ার; একপাশে কাঠের ছোট আলমারি. আলনায় দুই বোনের কাপড়জামা গোছানো, ড্রয়ারের মাথায় আয়না লাগানো, টুকটাক কিছু খুচরো জিনিস সাজানো রয়েছে।

অমল বলল, "দেখতে-দেখতে কেমন সন্ধে হয়ে এল। এখন যেন আরও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসে।"

বিছানার ওপর অলসভাবে বসেছিল ভ্রমর। তার মুখ চোখ সকালের মতন অবসাদে ময়লা নয়, কালো শুকনো চুলগুলি আঁট করে বাঁধা, শাড়ি জামা গোছানো। তবু, শুকনো ও মলিন ভাবটুকু মুখে পাতলা ছায়ার মতন লেগে আছে। মনে হচ্ছিল, ভ্রমর সকালের চেয়ে এখন অনেকটা ভাল।

ভ্রমর সামান্য গুছিয়ে বসল। তার পিঠের দিকের জানলা দিয়ে বাতাস আসছিল বলে গায়ের গরম চাদর ঘন করে জড়িয়ে নিল।

অমল বলল, "জ্বর দেখেছিলে?"

"না।" ভ্রমর ছোট করে জবাব দিল।

"না কি! তখন যে বললে—"

"সেরে আসছে!...এখন বেশী জ্বর নেই।"

"তবু জ্বর দেখা উচিত—" অমল এগিয়ে গেল, "কই, হাত দেখি—"

ভ্রমর সঙ্কোচ অনুভব করল বুঝি। বলল, "কাল সকালে আর জ্বর থাকবে না। তুমি বসো।"

অমল ভ্রমরের হাত স্পর্শ করে দেখল, কপালে হাত দিল। মনে হল, জ্বরটা কমছে। ভ্রমর চুপ করে বসে থাকল। এ-সময়, যখন অমল তার কপালে হাত রেখেছিল, তখন ভ্রমরের বুকের মধ্যে কেমন যেন ভার হয়ে আসছিল।

"জ্বর কম।" অমল বলল। বেশ বিচক্ষণ ডাক্তারের মতন তার ভাবভঙ্গি। জ্বর দেখা হয়ে গেলে অমল ভ্রমরের মুখোমুখি হয়ে তার পায়ের দিকে বসল। ভ্রমর আরও একটু পা গুটিয়ে নিল।

সামনে জানলা; অমল জানলার দিকে তাকিয়ে বাইরের সন্ধে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, "নতুন জায়গায় সন্ধেবেলা কেমন যেন লাগে, না ভ্রমর!...মন কেমন করে।"

ভ্রমর কথাটা বোঝবার জন্যে অমলের মুখ লক্ষ করল। ওকে অন্যমনস্ক, উদাস লাগল বুঝি। ভ্রমর ভাবল, বাড়ির জন্যে বোধ হয় অমলের মন কেমন করছে। বলল, "বাড়ির জন্যে মন খারাপ লাগছে!"

"বাড়ি! না, বাড়ির জন্যে নয়।" বলে অমল জানলা থেকে চোখ সরিয়ে ভ্রমরের দিকে তাকাল। ভ্রমরের মুখটি ছোট, কপাল সরু, গাল দুটি পাতার মতন, চিবুক একেবারে প্রতিমার ছাঁদ। রঙ শ্যামলা। ঘন টানা-টানা ভুরুর

তলায় কালো কালো ডাগর দুটি চোখ। পাতলা নাক, পাতলা ঠোঁট। মানুষের মুখ দেখলে এত মায়া হয়—অমল জানত না। ভ্রমরের মুখ দেখে অমলের কেন যেন মনে হয়, এমন মুখ আর সে দেখে নি। ফুলের মত ভাল। সুন্দর, দুঃখী. শান্ত মুখ।

অমলের হঠাৎ কেন যেন মনে হল, ভ্রমরের জন্যেই তার মন কেমন করছে।

"বাড়িতে চিঠি লিখেছ?" ভ্রমর জিজ্ঞেস করল।

"উঁ! চিঠি! হ্যাঁ, লিখেছি। আজ রোববার. পোস্টঅফিস বন্ধ।" বলে অমল কি ভেবে হাসি-ভরা মুখ করে বলল, "বাড়িতে থাকলে আজ দু-দুটো কাপড় পেতাম; খুব খাওয়াদাওয়া চলত।"

"কেন?"

"বা রে, আজ ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটায় কিছু পাওয়া যায়।" অমলের হঠাৎ বুঝি মনে হল ভ্রমর হয়ত ভাইফোঁটা বোঝে না। বলল, "ভাইফোঁটা কাকে বলে তুমি জানো?"

"দেখেছি।"

"তবে ত জানোই। কালীপুজোর পর পরই ভাইফোঁটা।" কালীপুজোর কথাতেই বোধহয় অমল কি ভেবে আচমকা বলল. "ভ্রমর, তুমি...তুমি খুব ভগবান বিশ্বাস করো, না—?"

ভ্রমর যেন কিছুক্ষণ কেমন অবাক হয়ে থাকল। তারপর ঘন চোখ তুলে বলল, "ভগবান বিশ্বাস না করলে পাপ হয়। যীশু ভগবানে বিশ্বাস রাখতে বলেছেন।"

বলে ভ্রমর অন্ধকারে দেওয়ালের দিকে তাকাল। যীশুর ছবি ছিল দেওয়ালে।

অমল অভিভূতের মতন বসে থাকল।

৩

সন্ধ্যাবেলায় বসার ঘরে আনন্দমোহন ও হিমানী বসেছিলেন। অমলরা এইমাত্র এসে বসল; বেড়াতে বেরিয়েছিল, সবে ফিরেছে।

আনন্দমোহন মাঝখানের সোফায় বসে; বিশ্রাম-সুখ উপভোগের শৈথিল্য তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে আছে। নতুন ইলাস্ট্রেটিড উইক্লির পাতা ওলটাচ্ছিলেন অলসভাবে, অমলদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলেন।

"কতদূর গিয়েছিলে?" আনন্দমোহন জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ডান হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ছিল।

প্রশ্নটা কাকে করা হল কেউ বুঝল না। অমল, ভ্রমর, কৃষ্ণা—তিনজনের যে কোনো একজনকে করা চলতে পারত। অমলই জবাব দিল, "এই কাছেই বেড়াচ্ছিলাম, রাস্তায়—।"

আনন্দমোহন সিগারেটের ছাই ফেলে একমুখ ধোঁয়া গলায় নিলেন। "এখানকার কিছু দেখলে? মিউজিআমে গিয়েছিলে?"

"না। যাব।"

"যাও একদিন, দেখে এসো। মিউজিআমটা ছোট, রিসেন্টলি হয়েছে; তবু দেখা উচিত। মুসলিম এজের কয়েকটা আর্ট-ওয়ার্ক আছে দেখার মতন—" কথাটা শেষ করে উনি ভ্রমরের দিকে তাকালেন। "তোরা এখানকার গাইড, ওকে কোথাও নিয়ে যাস না কেন?" হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে দিলেন সামনে।

ভ্রমর সামান্য তফাতে দেরাজের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সোফায় আড়াল পড়ায় তার সামান্য বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো ভঙ্গিটা নজরে পড়ছিল না। ভ্রমর কথাটা শুনল, বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল দু-পলক, কোনো জবাব দিল না।

"এখানে দেখার জিনিস নানারকম—" আনন্দমোহন অমলের দিকে তাকালেন আবার, যেন কি-কি দেখা দরকার তার বিবরণ দিচ্ছেন এমন গলা করে বললেন, "জল-চাঁদমারি দেখেছ? আমাদের এখানের ওল্ড প্যালেসে যাও একদিন, প্যালেস কম্পাউন্ডের মধ্যে জু আছে একটা, ভ্যারাইটি অফ বার্ডস্ দেখবে। এ ছাড়া, ওল্ড টাওয়ার—একশো দেড়শো বছরের পুরনো, ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে পড়েছিল, আজকাল সারিয়ে-টারিয়ে বেশ করেছে। তা কম উঁচু নয়, দু-আড়াইশো সিঁড়ি; আমি বাবা উঠতে পারি নি, বয়স হয়ে গেছে, এখন কি আর..." আনন্দমোহন প্রবীণত্বের স্মিত হাসি হাসলেন।

ওঁর বয়স এখন পঞ্চাশ। চেহারায় আরও একটু বেশী মনে হয়। ছিপছিপে গড়ন, রঙ ময়লা। মাথার চুল কোঁকড়ানো, বেশীর ভাগই সাদা। মুখ লম্বা

ধরনের, গালের হাড় চোখে পড়ে। নাকের ডগা একটু বেশী রকম মোটা ও ফোলা, ঠোঁট পুরু। চোখে ক্যারেট গোল্ডের চশমা। আনন্দমোহনকে সাদাসিধে সরল নির্বিরোধ শান্ত প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হয়।

"আমি জঙ্গল-চাঁদমারি দেখেছি।" অমল বলল।

"দেখেছ!...কেমন লাগল? ভাল নয়!...আমার, বুঝলে অমল, ওই জায়গাটা বেশ মনের মতন। কোয়্যাট, পিসফুল...। ওই জল-চাঁদমারি নিয়ে একটা গল্প আছে এখানে।"

জল-চাঁদমারির গল্প অমল ভ্রমরের কাছে শুনেছে। গল্পটার কথায় সে ভ্রমরের দিকে তাকাল। ভ্রমর এখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে কেন বসছে না অমল বুঝতে পারল না। ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। জ্বর থেকে উঠে ভ্রমর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিন-চারদিন কেটে গেল এখনও শরীরে জুত পাচ্ছে না। এক রাত্রির অসুখ তার অনেকখানি শক্তি শুষে নিয়েছে। ভ্রমরের শরীরের জন্যেই আজ অমল কাছাকাছি বেড়াচ্ছিল, দূরে কোথাও যায় নি। কৃষ্ণা তাই বিরক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে না বেড়িয়ে লীলাদের বাড়ি চলে গিয়েছিল। অমল অস্বস্তি বোধ করে ভ্রমরকে বার কয়েক দেখল এখন। ভ্রমরের বসা উচিত, এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর পায়ে কষ্ট হয়; ওর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

"চাঁদমারি হয় ডাঙায়—" আনন্দমোহন বললেন, "এখানে জল-চাঁদমারি কেন! গল্পটা যা বানিয়েছে এরা—"

"ভ্রমর আমায় বলেছে।" অমল বলল, "শীতকালে ওই ঝিলে অনেক পাখি আসত নানা দেশ থেকে, চাঁদনিরাতে নৌকো চড়ে রাজবাড়ির লোক আর সাহেব-মেমরা পাখি মেরে হাতের টিপ ঝালাত। একবার—"

একবার কি ঘটেছিল আনন্দমোহন অমলকে আর বলতে দিলেন না, নিজেই বললেন। শোনা গল্প অমল আরও একবার শুনল। শীতকালে রাজারাজড়াদের নেমন্তন্ন পেয়ে শিকারে আসত সাহেব-সুবোরা। বনজঙ্গলে শিকার চলত বাঘ ভাল্লুকের, আর ওই ঝিলে ছোট ছোট বোট ভাসিয়ে ওরা জ্যোৎস্না রাত্রে ফুর্তি করত, হাতের টিপ দেখাত, অকারণ আনন্দ পেতে ঘুমন্ত পাখিদের ওপর বন্দুকের ছররা গুলি চালাত। একবার বিশাল একঝাঁক অদ্ভুত পাখি, হিংস্র বন্য ভয়ঙ্কর বিহঙ্গরা তার শোধ নিল। পাঁচ-সাতশো পাখি জ্যোৎস্নাকিরণ আচ্ছন্ন করে এক শিকারী সাহেবের সারা গা কামড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে মেরে ফেলল, মেমসাহেবের একটি চোখ ঠুকরে অন্ধ করে দিল। তারপর থেকেই ওই ঝিলে পাখি শিকার বন্ধ।

আনন্দমোহন গল্প শেষ করলেন যখন, তখন অমল জল-চাঁদমারির এখনকার অবস্থাটা মনে-মনে দেখছিল। ঝিলটা সত্যিই মস্ত বড়, ডাঙায় অজস্র গাছপালা, কোথাও-কোথাও বেতঝোপ, জলে সবুজ ভেলভেটের মতন পুরু শ্যাওলা, তিরতিরে পাতা, জলজ উদ্ভিদ, আর রাশি রাশি পদ্ম, শালুক। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে। শান্ত নিস্তব্ধ নির্জন হয়ে থাকে জায়গাটা।

"আমি সেদিন গিয়েছিলাম। এবারে এখনও পাখি আসে নি।" অমল বলল।

"শীত পড়ে গেছে, এইবার আসবে—" আনন্দমোহন বললেন, "তবে শুনেছি আগের মতন ভ্যারাইটি আর আসে না।" চলে-যাওয়া পাখিগুলোর জন্যে যেন সামান্য বেদনা অনুভব করলেন উনি, সামান্য থেমে কি ভাবতে-ভাবতে বললেন,

"আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের বাঁকুড়ার দিকে ধানকাটা হয়ে যাবার পর শীতে এক-এক সিজন-এ বহু পাখি এসে যেত, মাঠে বসত, গাছপালায় থাকত, তারপর আবার উড়ে যেত দু-চার দিন পরেই। ওরা কোথায় যেত কে জানে, যাবার পথে আমাদের গ্রামগ্রামের দিকে রেস্ট নিতে থামত বোধ হয়—" আনন্দমোহন হাসার মতন মুখ করলেন সামান্য।

ভ্রমর তখনও দাঁড়িয়ে আছে। অমল অধৈর্য হয়ে উঠছিল। হিমানী একপাশে বসে উল বুনে যাচ্ছেন, কৃষ্ণা বসে-বসে কোলের ওপর ইলাস্ট্রেটেড উইকলি টেনে নিয়ে ছবি দেখছে।

"বুঝলে, অমল—" আনন্দমোহন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ বললেন, তাঁর গলার স্বর গাঢ় ও বিষণ্ণ শোনাচ্ছিল, "এ-সব জায়গার ভাল সবই, ক্লাইমেট ভাল, কাজকর্ম করে সুখ আছে, কলেজে অল্প ছেলে, ওবিডিয়েণ্ট...তবু আর ভাল লাগে না। বাঁকড়োর কথা বললাম না, সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন হয়ে গেল, আমাদের সেই নিজের দেশ-বাড়ির কথা মনে পড়ছে।...এবার রিটায়ার করে চলে যাব। আর ক'টা বছর!"

"ভ্রমর, তুমি বসো।" অমল আচমকা বলল, অধৈর্য হয়ে। এমন চোখ করে তাকাল যেন সে অত্যন্ত বিরক্ত ও অস্থির হয়ে উঠেছে।

ভ্রমর পলকের জন্যে চোখে চোখ রেখে অমলকে দেখল। এগিয়ে এসে কোথাও বসল না।

"কি রে, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন—?" আনন্দমোহন ঘাড় পাশ করে ভ্রমরকে দেখলেন একবার, "বোস, বোস কোথাও।...আচ্ছা শোন, আমার ঘর থেকে সিগারেটের টিনটা নিয়ে আয়—"

ভ্রমর সিগারেট আনতে চলে গেল। যাবার সময় একবার অমলের দিকে তাকিয়েছিল, যেন চোখে-চোখে বলে গেল, আ, ছটফট করো না, চুপ করে বসে থাক।

আনন্দমোহন আরও একটু অলসভাবে বসলেন, মাথার ওপর হাত তুলে আলস্য ভাঙলেন। বললেন, "মোহিতদাকে কতবার লিখেছি এই বেলা আমার জন্যে বাঁকড়ো টাউনের কাছেপিঠে একটু জমিজায়গা দেখে রাখতে—তা তোমার বাবা গা করে না। তার ধারণা আমি সারাটা জীবন বাইরে বাইরেই কাটাব।.. বাঙালীর ছেলে কোন দুঃখে বিদেশে পড়ে থাকে, বাড়ি ফিরতে তার কত সাধ তা তোমার বাবা যদি বুঝত...!"

"আমরাও ত বিহারে থাকি।" অমল হাসিমুখ করে বলল।

"তোমাদের বিহার বাঙলা দেশ থেকে ক' মাইল? গাড়িতে চেপে একবেলায় যাওয়া-আসা যায়। আমরা পড়ে আছি সাত আটশো মাইল দূরে।" বলে আনন্দমোহন একটু সময় চুপ করে মনে মনে কি ভাবলেন, তারপর হেসে ফেলে বললেন, "আজ কতকাল যে পোস্ত খাই নি তা যদি জানতে।"

হিমানী মুখ তুলে স্বামীকে দেখলেন একবার, কিছু বললেন না।

অমল হেসে ফেলল। তার বাবাও ঠিক এই রকম। খেতে বসে এক-একদিন হঠাৎ পোস্তর কথা মনে হলে মাকে বলেন, কই গো, একটু পোস্ত-টোস্ত করলে না। তুমিও ত বাঁকড়োর মেয়ে, পোস্ত খেতে ভুলে যাচ্ছ নাকি!

"বাবাও বলেন।" অমল বলল হাসির গলায়, "মাকে বলেন।"

ভ্রমর সিগারেটের টিন নিয়ে ফিরল। আনন্দমোহন হাত বাড়িয়ে টিনটা নিলেন। "বলবে বই কি! মোহিতদা আর আমি যখন কলেজে পড়তাম, কৃশ্চান কলেজে, তখন একবার ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে জয়েণ্টলি একটা রিসার্চ পেপার করব, পোস্তর নিউট্রিশান সম্পর্কে..." বলতে বলতে আনন্দমোহন হোহো করে হেসে উঠলেন। অমলও হাসল। হিমানী মুখ তুললেন। কৃষ্ণাও তাকিয়ে থাকল। ভ্রমর ততক্ষণে একপাশে বসেছে।

তোমার মা—মানে রমাদিকে আমরা মেজদি বলতাম ঠাট্টা করে। জ্ঞান-উকিলের মেয়ে, জ্ঞান দিয়ে কথা বলত; বলত, বেশী পোস্ত খেলে কুষ্ঠ হয়। মাথায় কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছিল কথাটা।" বলতে-বলতে সহসা তিনি থেমে গেলেন। এবং পরে চকিতে একবার ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে থাকলেন।

আনন্দমোহন কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়ান। সিনিআর প্রফেসার। অমল বাবার কথা এ-সময় না ভেবে পারল না। বাবা বি. এস-সি. পড়তে পড়তে রেলের মেকানিক্যাল ট্রেনিংয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। জামালপুরে ছিলেন। অমলও বি. এস-সি-তে অ্যাডমিশান নিয়েছিল, কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে অসুখ করল—টাইফয়েড, টানা দেড় মাস বিছানায়, তারপর শরীর কিছুটা সেরে উঠতে-উঠতে পুজো কাটল, বাবা ততদিনে অন্য ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, মেকানিক্যাল অ্যাপ্রেনটিশসিপ অমল পাবে এই রকম একটা কথা পেয়ে যাওয়ায় আর কলেজে পাঠালেন না অমলকে। বরং অসুখের পর শরীর স্বাস্থ্য ভাল করতে, বাইরে থেকে কিছুদিন বেড়িয়ে আসতে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন আনন্দমোহন। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে আস্তে আস্তে ঢোঁক গিলছিলেন। ঘরের আলো ধবধবে নয়; এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। বড় মতন একটা জাপানী বাতি জ্বলছিল, কাঁচের প্লেটের ওপর রাখা পেতলের পালিস করা টেবল-ল্যাম্প, বড় ফুলদানির মতন দেখতে অনেকটা, কাঁচের সরু চিমনি গলা তুলে আছে, গায়ে গোল ধবধবে সাদা ডোম। মোলায়েম আলোয় ঘর অর্ধেকটা আলোকিত, বাকিটুকু ছায়া-ছায়া, ধূসর। আনন্দমোহনের ছায়া হিমানীর কাছাকাছি গিয়ে আকারহীন হয়ে পড়ে আছে। হিমানীর ছায়া অন্ধকারে মিশেছে। ভ্রমর ও কৃষ্ণার পায়ের তলায় অমলের মাথার ছায়াটুকু দেখা যাচ্ছিল।

ঘরটা খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। আনন্দমোহন হয়ত তাঁর যৌবনের স্মৃতি দেখছিলেন, অথবা অন্য কোনো কথা ভাবছিলেন।

হিমানী বোনার কাঁটা কোলে রেখে বললেন, "ভ্রমর, তুমি ক'দিন কোনো উপাসনা গাও নি।"

ভ্রমর মা'র দিকে তাকাল। কৃষ্ণা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকায় চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে হয়ত পড়ার নাম করে উঠে যেত, উপাসনার কথায় উঠতে পারল।

নীরবে ভ্রমর উঠল। শান্তভাবে গিয়ে অর্গানের কাছে বসল। হিমানী কোলের ওপর থেকে উলের গোলা ও কাঁটা সরিয়ে পাশে রাখলেন। গায়ের চাদর গুছিয়ে সোজা শক্ত ভঙ্গিতে বসলেন এবার। কৃষ্ণাও স্থির হয়ে বসল।

অর্গানের শব্দ উঠল খাদে। রিডের ওপর দু-হাতের আঙুল ফেলে ভ্রমর কোনো গানের সুর তোলার আগে অন্যমনস্কভাবে একটু অর্গান বাজাল।

অমল মুখ ঘুরিয়ে বসল অর্গানের দিকে। আনন্দমোহন হাতের সিগারেট নিবিয়ে ছাইদানে ফেলে দিলেন। সোজা হয়ে বসলেন।

সুর তুলে ভ্রমর গান শুরু করল : তিনি মহিমাতে সজ্জিত...সদা প্রভু সজ্জিত...।"

অমল এ-বাড়িতে এসে এই রকম গান প্রথম শুনছে। ভ্রমর তাকে বলেছে এ-সব গান তাদের প্রার্থনা সংগীত। অন্য রকম উপাসনা সঙ্গীতও আছে—সেগুলো একেবারে বাঙলা—সবাই শুনেছে। তবে এই গানটা অন্যরকম, অদ্ভুত লাগে শুনতে। এ-গানের সুর অন্য গানের মতন নয়। মনে হয় যেন একটি স্থায়ী সুর রয়েছে, বাঁধা সুর, শুধু শব্দগুলি বদলে যাচ্ছে। অতি উচ্চে স্বর উঠছে না। প্রার্থনার মতনই আগাগোড়া গানটি গাওয়া হয়ে চলেছে। গানের পদগুলিও কেমন অদ্ভুত। ভ্রমর গাইছিল : "তোমার সিংহাসন অটল...হে সদা-প্রভু...চিরদিনের জন্য পবিত্রতা তোমার গৃহের শোভা।"

অর্গানের ঘন গম্ভীর শব্দের সঙ্গে ভ্রমরের মিষ্টি চিকন গলার সুর মধুর হয়ে মিশে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভ্রমর তার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে এই উপাসনাটুকু গাইছে, তার সমস্ত হৃদয় সদাপ্রভুর মহিমার কাছে নিবেদিত।

হিমানী শান্ত নিশ্চল হয়ে বসে, আনন্দমোহন শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। কৃষ্ণা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে, তার চোখ চঞ্চল। এই ঘরের আবহাওয়া আস্তে আস্তে কেমন পালটে গেল। এখন আর অন্য কিছু মনে পড়ছে না, ভ্রমরের মুখ আরও যেন করুণ, সুন্দর হয়ে উঠছে। অমলের ইচ্ছে হল ভ্রমরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওই গান একটু গায়, 'মহিমায় সজ্জিত' শব্দটা তার বড় ভাল লাগছিল। দরজার মাথায় মেহগনি কাঠের যীশুমূর্তির দিকে তাকিয়ে অমল সেখানে ঘরের ছায়া দেখল।

গান শেষ হল। উপাসনা শেষ করার মতই হিমানীরা মৃদু গলায় 'আমেন' বললেন। ক্রুশ আঁকলেন বুকে।

আনন্দমোহন আবার ঢিলে-ঢালা হয়ে বসলেন। বললেন, "আর একটা গান গা—, পুরনো সেই গানটা গা, অনেকদিন শুনি নি। এসো হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।"

কৃষ্ণা এবার উঠল। হিমানী জানলার খড়খড়ি শার্সি বন্ধ করে দিতে বললেন। বারান্দার দিকের সব ক'টি জানলার খড়খড়ি টেনে দিয়ে কৃষ্ণা বাইরের দরজাটাও বন্ধ করল, করে চলে গেল।

ভ্রমর অর্গানের রিডে আঙুল দিল আবার। গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে নীরবে বসে ছিল। নিশ্বাস নিচ্ছিল। আজকাল একটু গান গাইতে সে কেমন হাঁপিয়ে যায়। ঘরের আলো তার মুখে আলোছায়া মাখিয়ে রেখেছে।

সুরটা মনে করে নিতে একটু সময় নিল ভ্রমর, তারপর গানটা মাঝখান থেকে ধরল। এ-গানের সুর বাঁধা ঘাটে থাকল না, কখনও উঁচু পরদায় উঠছিল, কখনও খাদে নামছিল। ঘরের নিবিড় আবহাওয়ায় গানটি দেখতে-দেখতে কেমন আচ্ছন্ন অবস্থা করে আনল। ভ্রমরের গলার মধ্যে খুব মিহি করে যেন এক ধরনের কী পরদা লাগানো আছে, ঝিঁঝির শব্দের মতন কাঁপে, স্বরনালীর কোণে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে। অমল কান করে শুনল ভ্রমর চড়ায় গলা তুলতে পারে না। তবু সবটুকু আবেগ দিয়ে ভ্রমর গাইছিল : "আঁখি-পাশে এসো

নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি হে, এসো আবার সকল অঙ্গ জীবন সনে রাখি হে।"

অমল মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিল, শুনতে-শুনতে সে ভ্রমরের কষ্টটুকুও অনুভব করছিল। ভ্রমরের বুকে কষ্ট হচ্ছে, তার মুখ কেমন শুকনো হয়ে এসেছে—অমল এইসব ভাবছিল।

গান শেষ হল। হিমানী উঠলেন। উলের গোলা, কাঁটা হাতে নিয়ে বললেন, "তোমার গলা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যত্ন না নিলে কিছু থাকে না।"

ভ্রমর মুখ নীচু করল। যেন সে জানে, তার গলা খারাপ হয়ে গেছে। অক্ষমতার দুঃখটুকু তার মুখে ও আচরণে প্রকাশ পেল।

"মন না দিলে কিছু হয় না। তোমার আজকাল কোনদিকে মন নেই।" হিমানী বললেন, মুখের কোথাও বিরক্ত বা অসন্তোষ ফুটল না, শুধু গলার স্বর তাঁর অপছন্দ প্রকাশ করল।

হিমানী চলে গেলেন। অমল হিমানীমাসির ওপর ক্ষুব্ধ হল। ভ্রমর কিছু খারাপ গায় নি। তাদের বাড়িতে রীতিমত গানবাজনার চর্চা হয়। বাবা মা দুজনেই গানের ভক্ত, দিদিরা ছেলেবেলা থেকে মাস্টার রেখে গান শিখেছে, বউদি রাঁচির মেয়ে—বাঙলা গান খুব ভাল গায়। অমল গান বোঝে, সুরও বোঝে। গানটা টপ্পার ঢঙে, ভ্রমর বেসুরো কিছু গায় নি। তবে তার শরীর দুর্বল থাকলে সে কি করে গলা তুলবে, মানুষের গলা ত আর গ্রামোফোনের রেকর্ড নয়, দম দিলেই বাজবে!

"আমার খুব ভাল লেগেছে।" অমল আনন্দমোহনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল। যেন হিমানীর কথার প্রতিবাদ করে সে মেসোমশাইকেই কথাটা শোনাল।

আনন্দমোহন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। অমলের কথা কানে যায় নি। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

"ভ্রমরের গলা খুব মিষ্টি।" অমল আবার বলল।

অস্ফুট শব্দ করলেন আনন্দমোহন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। কথাটা যেন তিনি জানেন। ভ্রমরের দিকে তাকালেন, মনে হল কোনো কিছু বলবেন, বলার জন্যে অপেক্ষাও করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বললেন না।

ভ্রমর উঠে দাঁড়িয়েছিল। অমলের কথায় সে রাগ করেছে কি করে নি বোঝা গেল না; চেয়ার সরিয়ে নীচু মুখে সে আস্তে-আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ঘর এখন ফাঁকা লাগছিল। নীরবে দুজনে বসে। অমল শীত ভাবটা অনুভব করল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। গরম কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অমল কিছু বলব-বলব মুখ করে বসে থাকল।

"মেসোমশাই—" অমল এক সময় বলল।

আনন্দমোহন মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। অমলকে দেখছিলেন। মোহিতদার কথা তাঁর মনে পড়ছিল। অমলের মুখ তার বাবার মতন। একেবারে সেই রকম ছিমছাম মুখ, বড় কপাল, জোড়া ঘন ভুরু, চোখের কোণের দিকে পাতা দুটি জোড়া। মোহিতদার টিকোলো নাক ছিল, অমলের নাক অতটা টিকোলো না। থুতনিও ওর বাবার মতন, ছোট অথচ শক্ত। গায়ের রঙ আধ-ফরসা। মেজদির মতন ফরসা হয় নি। মেজদি এবং ভ্রমরের মা দুজনেই ফরসা ছিল। দূর সম্পর্কের বোন হলেও খুব বন্ধু ছিল। মেজদির ছেলেটি বেশ। সমস্ত

মুখে ছেলেমানুষি মাথানো। নরম শান্ত স্বভাব।

"মেসোমশাই, ভ্রমরের কোন অসুখ করেছে।" অমল বলল খুব আচমকা; এমন কি সে যেন নিজেও ভাল করে জানতে পারল না কি বলেছে।

"অসুখ!" আনন্দমোহন অসতর্কভাবে বললেন, নিম্নস্বরে। তাঁর দৃষ্টি খানিকটা অপরিচ্ছন্ন।

"ও খুব উইক। একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ে।" অমল যেন অত্যন্ত দায়িত্ববান হয়ে পড়ল হঠাৎ। ভ্রমরের অভিভাবকের মতন বলতে লাগল, "প্রায়ই জ্বর হয়। মাথা ঘোরে।"

"হ্যাঁ–" আনন্দমোহন মাথা নাড়লেন সামান্য, "খানিকটা অ্যানিমিক হয়ে পড়েছে। কি জানি, এ-রকম ভাল জায়গায় থাকে, তবু শরীর ভেঙে যাচ্ছে কেন! একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখাতে হবে।"

"জব্বলপুর..."

"জব্বলপুর নাগপুর যেখানে হোক নিয়ে যাব ওকে।...দেখি, এবার ক্রীশ-মাসের ছুটিতে..."

কথাটা আনন্দমোহন শেষ করলেন না আর।

অমল হিসেব করল। মাস দেড়েক প্রায়। ততদিনে অমলেরও যাবার সময় হয়ে যাবে। এ-সময় ভ্রমর যদি বাইরে যায় এ-বাড়ি অমলের ভাল লাগবে না। এক্মাসের পর অমলও ফিরবে, তখন যদি ভ্রমররা যায়, জব্বলপুর হলে সবচেয়ে ভাল, তাহলে অমলও সঙ্গে যেতে পারবে। মণ্টুমামার বাড়িতে সবাই মিলে উঠবে।

আনন্দমোহন আর কোনো কথা বলছেন না, তিনি অন্যমনস্ক, সিগারেট ধরিয়ে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি আবার টেনে নিয়েছেন দেখে অমল এবার উঠল। ভ্রমরকে আজ কথাটা সে বলবে। অমল একটু গর্ব অনুভব করল, যেন সে একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

অমল উঠে চলে যাচ্ছিল, আনন্দমোহন মৃদু গলায় বললেন, "বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ভ্রমরকে বলো সাবধানে থাকতে। ও কি-একটা টনিক খেত, সেটা খেয়ে যেতে বল।"

পোশাক পালটে অমল ট্রাউজারটা গুছিয়ে রাখছিল। রাখার সময় একা ঘরে গুনগুন করে গান গাইছিল। বাইরে খুব ঠাণ্ডা পড়ায় জানলাগুলো ভেজিয়ে দিয়েছে। ভ্রমর এসেছে অমল প্রথমে বুঝতে পারে নি। মুখ ফেরাবার পর ভ্রমরকে দেখতে পেল।

এ-সময় এক কাপ গরম দুধ বা কোকো খেতে হয়, হিমানীমাসির সংসারে নিত্যকর্মগুলি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। ভ্রমর কোকো নিয়ে এসেছিল।

অমল গুনগুন করে যা গাইছিল তার সঙ্গে ভ্রমরের গাওয়া শেষ গানটির সুরের মিল ছিল, কথার নয়। গান থামিয়ে ভ্রমরকে দেখে অমল উজ্জ্বল মুখ করে হাসল। বলল, "কি, এই রকম সুর না?"

ভ্রমর বেশ অবাক হয়েছিল। অমলকে সে গুনগুন করে কখনো-সখনো সুর আওড়াতে শুনেছে, কিন্তু গান গাইতে শোনে নি। আজ অমল সত্যি সত্যিই গান গাইছিল। এবং ভ্রমরের মনে হল, অমল গান গাইতে জানে।

"তুমি যদি গানটা লিখে দাও আমি সবটা গেয়ে দিতে পারি।" অমল হেসে

বলল, বলে এগিয়ে এসে ভ্রমরের হাত থেকে কোকোর কাপ নিল। "তোমার মতন অত ভাল করে গাইতে পারব না। তবে স্যার, চালিয়ে দেব ঠিক—" অমল উৎফুল্ল স্বরে হাসল। স্যার কথাটা বলে ফেলে সে যেন আরও মজা পেল।

অমলকে চোখে চোখে দেখল ভ্রমর। চোখ নামাল। বলল, "আমি কত গাইতে পারি!"

"পার না!" অমল চোখের পাতা বড় করে ঠাট্টা করল। বলল, "যা পার তাই বা ক'জন পারে!" বলে অমল কোকোর কাপে চুমুক দিল।

ভ্রমর দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে কমলা রঙের মিলের শাড়ি, গায়ে পুরো-হাতা বুক-খোলা মেয়েদের সোয়েটার, গলার কাছে পুরু করে আঁচলটা জড়ানো। ভ্রমর বাড়িতে যে-চটি পরে তার বাঁ-পায়ের গোড়ালিও তার বাইরে বেরোবার জুতোর মতনই উঁচু, সব সময়ই তাকে চটি পায়ে দিয়ে থাকতে হয়, নয়ত কষ্ট পায় চলাফেরায়।

বসার ঘরে হিমানীমাসি ভ্রমরের গান শুনে যে-কথা বলেছিলেন তাতে তার মন খারাপ হবার কথা। অমল বুঝতে পারল, ভ্রমরের মনে কথাটা এখনও লেগে আছে, সে ভুলে যেতে পারে নি।

"তোমার গলা সত্যিই খুব ভাল, ভ্রমর। আমি বলছি।" অমল গলায় যথেষ্ট জোর দিয়ে বলল, তার কথার মূল্য অন্যে স্বীকার করবে কি করবে-না গ্রাহ্য করল না। "আমি বেট্ ফেলতে পারি।"

ভ্রমর অন্য কথা ভাবছিল। তখন তার গান ভাল না লাগায় মা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। মা চলে যাবার পর অমল বাবার কাছে অমন করে তার ভাল-লাগার কথাটা কেন বলল! বলা উচিত হয় নি। যদি মা শুনতে পেত! যদি বাবা মাকে বলে মা বেশ রাগ করবে। ভ্রমর বলল, "তখন বাবার কাছে তুমি ও-রকম করলে কেন?"

"ও-রকম-- ? কি রকম?"

"গান ভাল লেগেছে বলে চেঁচিয়ে উঠলে।"

"বা রে...!" অমল ঘাড় দুলিয়ে বলল, "ভাল লাগলে বলব না!"

ভ্রমর আস্তে মাথা নাড়ল। "না। মা শুনলে খুব রাগ করত।"

"অমল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল ভ্রমর দাঁড়িয়ে আছে, বসছে না। "তুমি বসো, আমি বলছি একটা কথা।"

ভ্রমর দাঁড়িয়ে থাকল। সে এখন বসে-বসে গল্প করতে পারবে না।

"বসো না। বলছি বসতে—। তুমি বড় জেদী মেয়ে, ভ্রমর। তখন বসার ঘরে সকলে বসল তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে!" অমল অসহিষ্ণু হয়ে বলল।

বাবা-মা সামনে থাকলে ভ্রমর কোনোদিন বসতে পারে না। তার কেমন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়, একসঙ্গে বসলে যেন সে বাবা-মা'র সঙ্গে এক হয়ে গেল। "আমার ভাল লাগে না।" ভ্রমর বলল মৃদু গলায়।

অমল অনেকটা কোকো একচুমুকে খেয়ে নিল। বলল, "তুমি বসো, তোমায় একটা নতুন খবর দেবু।" খবরটা দেবার জন্যে অমল ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল অনেকক্ষণ থেকেই।

ভ্রমর এগিয়ে গিয়ে বিছানার ধার ঘেঁষে বসল। অমল তাকে কি বলবে বুঝতে পারল না।

"মেসোমশাইকে আজ বললাম—" অমল ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বলল।

ভ্রমর অবাক চোখ করে তাকাল। বাবাকে কি বলেছে অমল? কি বলতে পারে? অমল বড় ছটফটে, ভেবেচিন্তে কোনো কথা বলতে পারে না। ভ্রমর মনে-মনে উদ্বেগ বোধ করল।

"মেসোমশাইকে আজ আমি তোমার অসুখের কথা বললাম।" অমল বেশ বিজ্ঞজনোচিত গলা করে বলল।

ভ্রমর সচকিত হল, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে, অমলের কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। ডাগর দুটি চোখ তুলে অপলকে ভ্রমর তাকিয়ে থাকল।

"মেসোমশাই বললেন, এবার এক্সমাসের ছুটিতে তোমায় ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবেন। জব্বলপুর কিংবা নাগপুর।" বলতে-বলতে অমল থেমে গেল। ভ্রমরের মুখ দেখে তার গলার স্বর আর ফুটল না।

স্তব্ধ অসাড় হয়ে বসে আছে ভ্রমর। তার চোখের পাতা পড়ছে না। মুখ থমথম করছে। ভ্রমরের এই স্তব্ধতা অমলকে কেমন আড়ষ্ট করে তুলল। তার সমস্ত সাহস এখন কেমন ফুরিয়ে এল, সামান্য ভয় পেল অমল। ভ্রমর কি রাগ করল? রাগের কি আছে অমল ভেবে পেল না।

"আমি ত মেসোমশাইকে বলেছি—" অমল এমনভাবে বলল যেন সে বোঝাতে চাইল, সে কোনও দোষ করে নি, অন্যায় করে নি, ভ্রমর কেন রাগ করবে! "তুমি মাসিমাকে বলতে বারণ করেছিলে, আমি বলি নি।"

এ-ঘরে আলোটা এমন জায়গায় আছে, এবং তার আলো এত অনুজ্জ্বল যে ভ্রমর সামান্য আড়াল করলে তার মুখ আলো পায় না। ভ্রমর অমলের চোখ থেকে মুখ সরিয়ে নিল। কিছু বলল না।

অমল ক্ষুব্ধ হল, তার দুঃখ হল। ভ্রমর অযথা রাগ করছে। অসুখ হলে বলব না, জ্বর হলে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখব না, শরীর দুর্বল হবে, রাস্তায় মাথা ঘুরবে, কথা বলতে হাঁপিয়ে পড়ব—তবু কাউকে কিছু বলব না —ভ্রমরের এই স্বভাব অমলের ভাল লাগে না। অমল বলল, "ভ্রমর, তোমার যদি সবসময় অসুখ হয় তুমি বাঁচবে কি করে!"

বাঁচব কি করে! মা'র কথা ভ্রমরের মনে পড়ল। হিমানী-মা'র মুখেই ভ্রমর শুনেছে, তার মা'র নাকি সবসময় অসুখ লেগে থাকত। আজকাল অসুখের কথা বললে হিমানী-মা রাগ করে কখনও-কখনও বলে ফেলে, 'তুমি কি তোমার মা'র ধাত পাচ্ছ!' এ-সব কথা ভ্রমরের ভাল লাগে না।

অমল অসহিষ্ণু হয়ে ডাকল, "ভ্রমর—"

ভ্রমর এবার মুখ ফেরাল। চাপা গলায় ধীরে-ধীরে বলল, "বাবাকে আর কি বলেছ?"

"বললাম যে; অসুখের কথা বলেছি। বলেছি তোমার জ্বর হয়, তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ, তুমি..."

"বাবা কি বললেন?"

"বললেন, ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, তুমি যেন সাবধানে থাক, কি একটা ওষুধ আছে তোমার সেটা খেতে বললেন।" অমল থামল। সামান্য থেমে বলল, "মেসোমশাই তোমায় ডাক্তার দেখাতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন শীঘ্রি...।"

ভ্রমর নিশ্বাস ফেলল। অমল যেন কানে শুনতে পেল শব্দটা। তার ভাল লাগল না। দুঃখ পাবার মতন করে অমল বলল, "ভ্রমর, আমি...আমি একটা কথা জানি।"

জলের মতন ভিজে-ভিজে দুটি কালো চোখ তুলে ভ্রমর অমলের দিকে তাকাল।

অমল ঘাড় নীচু করল। বলল, "তোমার নিজের মা নেই!...আমি তোমার তোমার মা'র নামও জানি।"

ভ্রমর নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকল। নিজের মা'র নামটি ভ্রমর এখন মনে করতে পারছিল। সুখতারা। তার মা'র নাম ছিল সুখতারা। দেবকীসিস্টার তাকে মা'র ছবি দেখাত, সিস্টারের কাছে মা'র ছবি ছিল। কোনো ছবিতেই মা'র হাসিখুশী মুখ দেখে নি ভ্রমর।

৪

বাগানে কলাগাছের ঝোপের তলায় ছায়ায় অমল দুপুর কাটাচ্ছিল। ক্যাম্বিসের একটা চেয়ার এনে পেতেছে বাগানে; খানিক রোদ, খানিকটা ছায়ায় গা ডুবিয়ে বসে আছে। ঘরে এ-সময়টা ভাল লাগে না, জানলা থেকে রোদ সরে যায়, ছায়া ভরে থাকে, স্যাঁতস্যাঁতে করে দেওয়ালগুলো। দেখতে-দেখতে মাত্র ক'দিনের মধ্যেই কি-রকম শীত পড়ে গেল। পুরোপুরি শীতকাল হয়ে গেল এখানে। ঘরে থাকলে এই দুপুরে ঘুমোতে হবে; লেপ গায়ে টেনে একবার শুয়ে পড়লে ঘুম ভাঙবে অবেলায়। দুদিন এই রকম হয়েছে অমলের, বিকেল পড়ে গেছে যখন, তখন ঘুম ভেঙেছে। তাতে সারা শরীরে আলস্য ও জড়তা ভরে ছিল, রাত্রে ঘুম আসছিল না। একলা একটা ঘরে শুয়ে রাত্রে ঘুম না এলে কত রকম কথা ভাবতে হয়, শেষে ভয়-ভয় করে, নতুন জায়গা বলেই হয়ত নানা রকম শব্দ শুনতে পায়, কখনও গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে, কখনও কোনো পাখি কেঁদে উঠল, কখনও মনে হল ভ্রমর বুঝি বাথরুম যেতে গিয়ে পা বেধে পড়ে গেল। বাড়ির কথাও ভীষণ মনে পড়ে, মনে হয় মা বুঝি তাকে দেখছে, দিদি ঠাট্টা করে বলছে—'কি রে, কেমন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিস. যা না দূরে বেড়াতে, মজা বোঝ।' দাদা বউদিও তাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে খুঁতখুঁত করছে।

দুপুরের ঘুমে কোন সুখ নেই দেখে এবং অমলের অভ্যাস নয় বলে সে আর ঘরে থাকছে না। স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা থেকে বাইরে এসে রোদ-ছায়ার মধ্যে বসে দুপুর কাটাচ্ছে কাল থেকে। বেশ লাগে। আকাশে অফুরন্ত রোদ, নীল হয়ে আছে আকাশটা, সূর্য কোথায় টলে গেছে, আলোর খর ভাব মরে গেছে, কী মিষ্টি গরম থেকে গেছে রোদটা। এ-সময় মাথাটুকু বাঁচিয়ে, রোদে গা রেখে শুয়ে থাকতে খুব আরাম। আলস্য যেন সর্বাঙ্গ মজিয়ে রাখে, তন্দ্রা আসে, দু-চোখের পাতা জুড়ে আসে, কিন্তু অকাতর ঘুম আসে না।

অমল আজ চেয়ারে শুয়ে-শুয়ে তার মনোমতন দুপুরটুকু কাটাচ্ছিল। মাথার ওপর কলাগাছের পাতা মস্ত ছাতার মতন বিছানো; গায়ে পায়ে রোদ ছড়িয়ে আছে, তাত লাগলে সে সামান্য সরে বসছে। ভ্রমরদের বাড়িটার মাথায় টালির ছাউনি. দুপুরের রোদ সেখানে মেটে-মেটে পোড়া রঙ ধরিয়েছে; প্রায়-নিস্তব্ধ এই বাগানে মাঝে মাঝে পাখি ডাকছে, অমলের সামনে কখনও ফরফর করে উড়ে এসে মাঠে বসছে। লীলাদের সেই ধবধবে সাদা পায়রা জোড়ার একটা সামান্য আগে এখানে এসেছিল, এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

হাতের বইটা মুড়ে ফেলল অমল। বাংলা বাইবেল। ভ্রমরের কাছ থেকে পড়তে নিয়েছিল। খানিকটা পড়েছে। ভাল করে কিছুই মাথায় ঢুকছিল না।

গল্প-গল্প যেটুকু, সেটুকু বুঝতে পারলেও এমন বেয়াড়া করে বাংলা লেখা যে, অমল অর্ধেক কথার মানেই ধরতে পারছিল না। মধুপুরার স্কুলে একবার দুই পাদ্রী বুড়ো এসেছিল। তারা ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেদের কাউকে মথির সুসমাচার, কাউকে লুক-লিখিত সুসমাচার দিয়েছিল। ছোট-ছোট কাগজও দিয়েছিল হাতে গুঁজে। অমল পেয়েছিল লুক। অমল লুক-এর সুসমাচার খানিক-খানিক পড়েছিল। এখনও তার সেই গল্পটা মনে আছে, এক নগরে এসে যীশু একজন কুষ্ঠ-রোগী ও একজন পক্ষাঘাত-রোগীকে সারিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুলে হেডমাস্টারমশাই একদিন ইংরেজীর ক্লাসে ইংরেজী বাইবেল থেকে আবার ঠিক ওই গল্পটাই পড়ে শুনিয়েছিলেন। একটা কথা ছিল তার মধ্যে : "অ্যারাইজ, অ্যান্ড টেক আপ দাই কাউচ অ্যান্ড গো আনটু দাই হাউস।" কথাটা তার মনে আছে, কেননা, হেডমাস্টারমশাইয়ের ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর তারা কয়েকজন কৌতূহলবশে ও খেলাচ্ছলে কথাটা সেদিন বার বার বলেছিল নিজেদের মধ্যে।

অমল বই মুড়ে কোলের ওপর রেখে হাই তুলল। আড়মোড়া ভেঙে সামনে তাকিয়ে থাকল। ছুপুরটা একেবারে লালচে-হলুদ গাঁদাফুলের মতন রঙ ধরে আছে, ঝিমঝিম করছে, ঠিক মনে হচ্ছে নিরিবিলিতে আকাশের কোলে গা গড়িয়ে নিচ্ছে। এখন সব চুপচাপ, সব শান্ত। বাগানে সবুজ ঘাসে কখনও দু-একটা ফড়িং, দু-চারটে চড়ুই নাচানাচি করছে। কোথাও বুঝি এ-বাড়ির কাক ও-বাড়ির কাকের সঙ্গে গল্প করছিল, তাদের কা-কা ডাক থেকে অমলের সেই রকম মনে হল। ভ্রমরের বেড়ালটাও ফুলবাগানের কাছে খানিক ঘোরাঘুরি করে বারান্দায় গিয়ে গা-গুটিয়ে ঘুমোতে শুরু করেছে।

আকাশের দিকে তাকাল অমল। অনেক যেন উঁচুতে উঠে গেছে আকাশ, খুব গভীর দেখাচ্ছে; রোদের তলা দিয়ে অনেক গভীরে যেন আকাশ দেখছে। বিন্দু-বিন্দু কালো ফোঁটা হয়ে চিল উড়ছে ওখানে। সাদা মতন একটুকরো মেঘ একপাশে দ্বীপের মতন পড়ে আছে, সেখানে চিল নেই, আকাশের নীল নেই।

আবার হাই উঠল অমলের। দুপুর ফুরিয়ে আসার বেলায় এ-রকম হয়, ঘুম পায়। চোখ জড়িয়ে আসছিল। চোখ বুজে অমল শুয়ে থাকল। শীতের বাতাস সহসা গা শিউরে দিল। বুকের ওপর দু-হাত জড়িয়ে, কোলে বাইবেল রেখে অমল শুয়ে থাকল। তার বোজা চোখের পাতার তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ ঝাপসা করে কেমন একটু স্বপ্ন মতন এল। এবং সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতেই অমল চোখ মেলে দেখল, ভ্রমর তাকে ডাকছে : "এই—!"

ভ্রমরদের ঘরের জানলা দিয়ে হাতছানি দিয়ে সে ডাকছিল। কলাগাছের ঝোপ, অমল যেখানে বসে আছে, ভ্রমরদের ঘরের মুখোমুখি। অমল উঠল না। মুখ ফিরিয়ে নিল। ভ্রমরের ওপর অমল একটু রেগেছে। দুপুর বেলায় একা-একা বসে থাকলেও আলস্য এসে ঘুম পায় বলে অমল আজ বলেছিল, 'তুমিও বাইরে রোদে গিয়ে বসবে চলো, গল্প করব।' ভ্রমর মাথা নেড়েছিল, না, সে যাবে না। তার কাজ আছে।

ভ্রমর আবার ডাকল।

অমল মুখ ফেরাত না, কিন্তু সে গাঁদা-ঝোপের দিক থেকে মস্ত এক প্রজাপতিকে ঘাসের ওপর দিয়ে উড়ে-উড়ে আসতে দেখল। ঘন বেগুনী রঙের

প্রজাপতিটা পায়ের কাছে এলে অমল তার ডানায় গোল-গোল দুটি চক্র দেখল, লালচে চক্র; প্রজাপতিটা ঘাসের ডগায়-ডগায় উড়ে ভ্রমরের জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অমল প্রজাপতি দেখার জন্যে মুখ ফেরাল, তারপর চোখে-চোখে সেই প্রজাপতিকে ধরে রাখতে গিয়ে একসময় আর প্রজাপতি দেখতে পেল না। দেখল, জানলায় ভ্রমর দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে আর ডাকছে না ভ্রমর।

সামান্য বসে থেকে এবারে অমল উঠল। বই হাতে করে ভ্রমরের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "কি?"

ভ্রমর বুঝি খুব মনোযোগ দিয়ে অমলের মুখ দেখল। "ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"না। ঝিমুনি এসেছিল।"

"কতক্ষণ ডাকছি—"

"কেন?"

"ঘরে এসো, বলছি।"

অমল ভ্রমরকে লক্ষ করে দেখল। ভ্রমরের চোখের পাতা ফোলা, গালে বালিশের ঝালরের দাগ পড়েছে। ঘুমোচ্ছিল ভ্রমর। যেন হাসি-হাসি ভাব লুকিয়ে সে তাকিয়ে আছে। অমল কলাঝোপের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। "চেয়ার পড়ে আছে।"

"আমি তুলিয়ে দেব। আয়াকে বলবো...।"

ভাবল অমল। তার রাগ পড়ে গিয়েছিল। অভিমান করতেও সাহস হল না। ভ্রমরই হয়ত এবার রাগ করে বসবে। বলল, "আসছি।" বলে অমল কলা-ঝোপের দিকেই এগিয়ে গেল।

বারান্দায় চেয়ার তুলে রেখে অমল ঘরে এল। আসার সময় বসার ঘরে এবং খাবার ঘরের মধ্য দিয়ে এল। হিমানীমাসির ঘরের দরজা ভেজানো। ঘুমোচ্ছেন। মেসোমশাই কলেজে, কৃষ্ণা স্কুলে; এ-সময় প্রত্যেকটি ঘর নিঃশব্দ, গোটা বাড়ি নির্জন, নিঝুম হয়ে থাকে।

ভ্রমরের ঘরে এসে অমল দেখল, বিছানার ওপর ভ্রমর বসে আছে। মাথার দিকে বইপত্র ফাউন্টেনপেন ছড়ানো। ভ্রমর ঘরে বসে-বসে পড়াশোনা করে। সে গত বছর পরীক্ষা দিয়ে হাইস্কুল পরীক্ষা পাশ করেছে। ইণ্টারমিডিয়েটের বইপত্র নিয়ে বাড়িতে বসে পড়ে। এখানকার কলেজে যায় না। তার ভাল লাগে না। কৃষ্ণাদের স্কুলের সঙ্গেই মেয়েদের কলেজ, ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়। অল্প কিছু মেয়ে। কিন্তু কলেজ অনেকটা দূরে, হেঁটে বা সাইকেল চড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, টাঙা করে প্রত্যহ দু-বেলা আসা-যাওয়ারও অসুবিধে। তা ছাড়া, এই পড়াশোনা যখন শখের, তখন অকারণে কলেজ ছোটা কেন!

ঘরে ঢুকে অমল প্রথমে ভেবেছিল, ভ্রমর হয়ত তাকে একটা বিদঘুটে কোনো পড়ার কথা জিজ্ঞেস করবে। সেদিন যেমন জিজ্ঞেস করেছিল, ইনকিউ-বেশান পিরিআড কাকে বলে?...অমল জীবনে কখনও ও-রকম শব্দ শোনে নি। অবাক হয়ে বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকল। হোমসাইন্স একটা বাজে সাবজেক্ট। যা-তা একেবারে। শেষে বই দেখে তবে অমলকে বুঝতে হল।

শরীরের মধ্যে রোগ এসে ঢোকার পর সম্পূর্ণভাবে রোগ-লক্ষণ ফুটে ওঠা পর্যন্ত যে সময়, তাকে বলে ইনকিউবেশান পিরিআড।

আজ ভ্রমর সে-সব কিছু জিজ্ঞেস করল না। দু-চারটে টুকরো কথার পর বলল, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তুমি চলে যাচ্ছ এখান থেকে, সুটকেস-টুটকেস নিয়ে। ঘুম ভেঙে গেল..." বলতে বলতে ভ্রমর হাসল। পাতলা দুটি ঠোঁট এবং গাল হাসির জলে ভিজে উঠল যেন, চোখ দুটি খুব মধুর দেখাল। "উঠে গিয়ে তাই দেখলাম।..." ভ্রমর এবার দুষ্টুমি করে তাকাল। তার দৃষ্টি যেন বলতে চাইল, দেখলাম সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ কি না!

অমল অবাক হয়ে ভাবল, একটু আগে সে-ও তন্দ্রার মধ্যে ভ্রমরকে দেখেছে। দুজনে একই স্বপ্ন দেখে নাকি?

"আমিও তোমায় দেখলাম—" অমল বলল, "তখন ঝিমুনি মতন এসেছিল, হঠাৎ দেখলাম তুমি..." বলতে-বলতে সে থেমে গেল।

ভ্রমর যেন বিশ্বাস করতে পারল না। "সত্যি!"

"সত্যি বলছি।"

"আমায় দেখলে?"

মাথা নাড়ল অমল। হাতের বাইবেল বইটা বিছানায় রাখল। বড় ভারী। ডিকশনারির মতন মোটা।

"স্বপ্ন?" ভ্রমর শুধলো।

"স্বপ্ন-টপ্নই হবে।"

"কি দেখলে?"

কি দেখেছিল অমল, ঠিক তা বলতে চাইছিল না। লুকোবার ইচ্ছে হওয়ায় সে অন্য কিছু বলতে গেল, কিন্তু গুছিয়ে নিতে পারল না। না পেরে বলল, "আমি তোমার বাইবেলটা পড়ছিলাম বলে ওই রকম দেখলাম।"

"কি দেখলে বলো? খালি..." ভ্রমর বায়না করার মতন ছেলেমানুষি সুর করল।

অমল মুশকিলে পড়ল। কথাটা তার বলতে ইচ্ছে করছে না। ভ্রমর শুনলে কষ্ট পাবে। অমল লুক-সমাচারের গল্পটা ভাবছিল বলে স্বপ্ন দেখেছে, ভ্রমর যেন কোথায় গেছে, তার সামনে মস্ত এক সাধুপুরুষ দাঁড়িয়ে, তাঁর পিঠের চারপাশে আলো, ভ্রমর হাত জোড় করে বসে আছে। কারা যেন বলছিল, ইনি যীশু, ইনি মানুষের রোগ তাপ নিবারণ করেন। ভ্রমরের খোঁড়া পা সারিয়ে দেবেন।

অমল ইতস্তত করে বলল, "আমি দেখলাম তুমি যীশুর কাছে গেছ।"

ভ্রমর কেমন হতবাক্ ও অভিভূত হল। অমলের চোখে চোখ রেখে অপলকে তাকিয়ে থাকল। মনে হল, সে যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছে।

অমলের তখনও ভয় করছিল, সে ভাবছিল এর পরও যদি ভ্রমর জিজ্ঞেস করে, আমি তাঁর কাছে গিয়ে কি করছিলাম, তখন অমল কি বলবে! অমল মনে-মনে ঠিক করল, সে আর-কিছু জানাবে না, বলবে—ওই ত, আমি আর-কিছু দেখিনি।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর ভ্রমর দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলল। তার

মুখ সামান্য সময়ের জন্যে খুব উদাস এবং অন্যমনস্ক ছিল। অমলকে সে দেখছিল না, ঘরের দেওয়ালে ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে যেন অন্য কোনো জগতের কিছু দেখছিল, তারপর তার আবিষ্ট ভাব কেটে গেলে ভ্রমর নিশ্বাস ফেলল, অমলকে আবার দেখল চেয়ে চেয়ে।

ভ্রমর কি বলে বসবে ভেবে না পেয়ে অমল বুদ্ধিমানের মতন অন্য কথা পাড়ল। "তোমার ওই বাইবেল আমি কিছু বুঝতে পারি না। কি কটমটে বাংলা।"

"আমার কাছে আর-একটা বই আছে, স্টোরিস ফ্রম বাইবেল—!"

"গল্প?"

"বাইবেলের গল্প।"

"এ-সব গল্পই, না সত্যি সত্যি?"

"সত্যি।"

"যীশু কুষ্ঠ রোগীদের সারাতে পারতেন?" অমল সন্দেহ প্রকাশ করল।

"তিনি সব পারতেন।" ভ্রমর শান্ত গলায় বলল; তার কোথাও কোনো সন্দেহ নেই।

"কী জানি! আমার এ-সব বিশ্বাস হয় না।" অমল বলল, বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমাদের ঠাকুর-দেবতারাও সবকিছু করতে পারতেন! তুমি সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প জান?"

"জানি। আমি রামায়ণ মহাভারত পড়েছি। মা'র কাছে গল্পও শুনতাম ছেলেবেলায়। কত শুনেছি, ভুলে গেছি।"

অমল এক ধরনের লজ্জা অনুভব করল। তাড়াতাড়ি বলল, "যেশাস-এর গল্পও আমরা স্কুল থেকে শুনেছি। আমার খুব ভাল লাগে।"

"আমি তোমায় একদিন সবটা বলব।"

"বলো। কিন্তু..." অমল যা ভাবছিল, তা গুছিয়ে বলতে পারছিল না বলে কেমন বিব্রত হচ্ছিল। শেষে বলল, "আগেকার দিনের লোকেরা নানারকম গল্প তৈরী করত। তারা জানত না বলে ভাবত, পৃথিবী বাসুকীর ফণার ওপর বসানো আছে। তারা বলত, ভগবান জল করলেন, স্থল করলেন, আকাশ করলেন..। আজকাল লোকে এ-সব বিশ্বাস করবে না। তুমি যদি বলো, আকাশের ওপর ভগবানরা থাকে, আমি বিশ্বাস করব না। গ্যালিলিও, তুমি গ্যালিলিওর কথা শুনেছ...?"

ভ্রমর মাথা নাড়ল, শুনেছে।

অমল বলল, "তবে! দূরবীনে আকাশ আকাশ।...তুমি কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে দেখে নেবে ত!"

ভ্রমর আহত হল না, রাগ করল না। বলল, "ভগবানকে পরীক্ষা করতে নেই। যীশু বারণ করেছেন।...আর ভগবান আমাদের কাছেই আছেন। ভালবাসা, সেবা, দুঃখীর ওপর মমতা...; না থাক, তুমি কেমন মুখ করছ, আমি বলব না।"

অমল বাস্তবিকই কিছু করে নি, কিন্তু ভ্রমর কেমন লজ্জা পেল যেন, কিংবা বাধা পেল কোথাও; চুপ করে গেল। চোখ নীচু করে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে কৃষ্ণার বিছানার দিকে তাকাল। নরম গলায় বলল,

"যীশু নিজের জন্যে কিছু চান নি, সকলকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তবু কত কষ্ট দিয়ে মানুষ তাঁকে মেরেছিল।...আমরা বড় নিষ্ঠুর। ভালবাসা জানি না।" বলতে-বলতে ভ্রমর এত তন্ময় হয়েছিল যে, সে তার ধরে-যাওয়া গলার স্বরও পরিষ্কার করল না।

অমল কথা বলল না। ভ্রমর যখন ভগবানের কথা বলে তখন তাকে অন্য-রকম মনে হয়, পবিত্র, সরল এবং বিশ্বাসী। অমল ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু ভ্রমরকে এ-সময় যেন অনেক বড় বলে মনে হয়, যেন অনেক বেশী জানে ভ্রমর। নিজেকে বরং অমলের ছোট লাগে, তার তর্ক বা ঝগড়া করতে আর ইচ্ছে করে না। এখন অমলের মনে হল, ভ্রমর ঠিকই বলেছে, সমস্ত মানুষ যদি ভাল হত, আমরা সকলে সকলকে যদি ভালবাসতাম, তবে সবাই সুখী হত। ভ্রমরকে কেন হিমানীমাসি ভালবাসে না, কেন কৃষ্ণা তার দিদিকে খুব ভাল-বাসে না? এ-বাড়ির সকলে যদি ভ্রমরকে ভালবাসত, তবে ভ্রমর দুঃখী হত না, তার অসুখ থাকত না। ভালবাসা পেলে অসুখ থাকে না—এই আশ্চর্য কথাটা অমলের মাথায় আসার পর সে নিজেই কেমন অবাক ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকল।

ভ্রমর অন্য কথা পাড়ল। বলল, "তোমার কোটের বোতাম সেলাই করে দিয়েছি।"

অমল মুখ ফেরাল। ভ্রমরকে দেখল। জানলা দিয়ে পালানো দুপুরটা চোখে পড়ল। আলো আরও নিস্তেজ হয়ে গেছে; ঘরে বসে রোদ দেখা যাচ্ছিল না। বাইরে বাতাস বইতে শুরু করেছে দমকা, সরসর শব্দ হচ্ছিল। পড়ন্ত দুপুরে মনটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে আজকাল।

"আজ আমায় চকে যেতে হবে।" ভ্রমর বলল।

"চক?"

"বাজারে যাব, বাড়ির জিনিসপত্র কিনতে হবে।"

"কি জিনিস?"

"অনেক কিছু। মা লিখে দেবে।"

"মাসিমা যাবেন না?"

"মা বড় যায় না; আমি যাই। বরাবর। কৃষ্ণাও যায়। কৃষ্ণাও আজ যাবে না।"

"টাওয়ার আর দেখতে যাওয়া হচ্ছে না—তুমি রোজ দিন বদলাচ্ছ! কাল—"

"কাল হবে না; কাল রোববার। আমরা থাকব না।"

"পরশু আমি যাবই।"

ভ্রমর হাসল। হাসিটা খুব স্নিগ্ধ এবং সকৌতুক।

অমল বুঝতে পারল না ভ্রমর হাসল কেন? বলল, "হাসলে যে!"

"কই—!"

"ইয়ার্কি হচ্ছে!"

"না, মোটেও না।"

"তবে?"

"টাওয়ার দেখা হয়ে গেলেই তোমার এখানকার সব দেখা হয়ে গেল। তারপর...?"

"কত বেড়াবার জায়গা রয়েছে, এমনি বেড়াব।" অমল বলল, বলেই তার

মনে পড়ে গেল একদিন ভ্রমরকে সঙ্গে করে জল-চাঁদমারি যাবার কথা আছে। "একদিন তোমার সঙ্গে জল-চাঁদমারি যাবার কথা আছে, স্যার। সেবার আমি একলা গিয়েছিলাম।"

ভ্রমর বালিশের পাশ থেকে বইপত্র কলম গুছিয়ে তুলে নিতে লাগল। বলল, "তুমি যা ছটফটে ছেলে, টাওয়ার দেখা হয়ে গেলেই তখন আর এখানে দেখার কিছু থাকবে না, তোমার থাকতে ভাল লাগবে না, চলে যাবে।"

"চলে যাব!...কোথায় যাব?"

"জব্বলপুর। তোমার মণ্টুমামার কাছে।"

"হ্যাত্! মণ্টুমামার কাছে অতদিন কে থাকে! আমি এখানেই থাকব—।"

বিছানা থেকে উঠতে-উঠতে ভ্রমর হেসে বলল, "সুটকেস-টুটকেস নিয়ে চলে যাবে না তবে!...আমার তখন এত খারাপ লাগছিল..." বলতে-বলতে ভ্রমর যেন খুব লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

রাত্রে চক থেকে ওরা ফিরছিল। বেশী রাত করবে না করবে না করেও যখন চকবাজার থেকে টাঙায় উঠল তখন আটটা বাজে প্রায়। টুকটাক জিনিস কিনতে হয়েছে অনেক, সারা মাসের সাংসারিক খুচরো জিনিস। সাবান দু-দফা, টুথপেস্ট, মাথায় মাখার তেল, বিস্কুট, মাখন, আনন্দবাবুর জন্যে মনাক্কা আর সিগারেটের টিন, কৃষ্ণার রিবন, সাদা মোজা, কেডস জুতোর কালি, হিমানীর ক্রুশন সল্ট, আরও কত কি। মুখে মাখার ক্রীম আর গ্লিসারিন কিনতেই ভ্রমরের আধ ঘণ্টা গেল। স্টেশনারী দোকানের মালিক ভ্রমরকে বসিয়ে নানারকম গল্প জুড়ল। বুড়ো লোক, ভ্রমরকে 'বেটি বেটি' করে আদর আপ্যায়ন করতে লাগল এত যে, অমলের মনে হল সারা রাতই বুঝি বসিয়ে রাখবে। সেখান থেকে কাপড়ের দোকান; কৃষ্ণার কামিজ হবে একটা— মাপ দোকানেই পড়ে আছে, কাপড় পছন্দ করে দিতে হল; ভ্রমর কৃষ্ণার জিনিস পছন্দ করতে সবসময় ভয় পায়, কি জানি, কৃষ্ণা যদি ঠোঁট ওলটায়। লংক্লথ নিতে হল খানিকটা, শেমিজ হবে মেয়েদের। তারপর অল্প কিছু সবজি-টবজিও কিনতে হল।

বাজার থেকে বেরোতে-বেরোতে আটটা বাজল প্রায়। টাঙার সামনে গোল-মতন ঝুড়িতে মালপত্র। কয়েকটা খুচরো জিনিস বেতের টুকরিতে। চকবাজার বেশ গমগম করছিল, আলোয় ভরা, কাছেই একটা সিনেমা হাউস আছে, সেখানে হিন্দী বই হচ্ছিল। এদের গা-সওয়া শীত, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, গরম জামা পরে, র‍্যাপার চাপিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ অমলের মনে হল ডিসেম্বরের শুরুতেই জোর ঠাণ্ডা পড়ে গেছে।

চকবাজার ছাড়িয়ে আসতে শীতের কনকনে বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল। বেশ কুয়াশা চোখে পড়ল, ধোঁয়ার মতন জমে আছে। ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, চোখ জ্বালা করে; কুয়াশায় সব কেমন ঠাণ্ডা লাগে, নাক মুখ শীতল হয়ে থাকে। অমল শখ করে পান কিনেছিল, নিজে খেয়েছে, ভ্রমরকেও খাইয়েছে। পানের অবশিষ্টটুকু তার মুখে ছিল। অমল এবার বলল, "একটা জিনিস কিনেছি, এবার খাব।"

চক ছাড়িয়ে এসে খুব বড় একটা তলাও-এর পাশ দিয়ে টাঙাটা চলছে। রাস্তায় তেমন একটা আলো নেই, এই অঞ্চলটা বাজারপট্টির প্রান্ত, ছোটখাট দোকান আছে, কোনোটাতে তুলো বিক্রি হয়, কোনোটাতে বা সাইকেল সারাই করে। মিটমিটে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোথাও কোনো ফলঅলাও বসেছিল চালার তলায়।

ভ্রমর আজ খুব সাবধান হয়ে বেরিয়েছে। গায়ে পুরো-হাতা শর্ট কোট। কালো রঙ কোটটার, গলার কাছে মস্ত কলার। পায়ে মোজা পরেছে। কোটের পকেটে স্কার্ফ রেখেছে মাথায় বাঁধবে বলে, এখনও বাঁধে নি।

অমল পকেট হাতড়ে কি যেন বের করতে লাগল।

ভ্রমর বলল, "অনেক দেরি হয়ে গেল, না—?"

"হবে না! তোমার দেখলাম পুরো বাজারটাই চেনা।" অমল ঠাট্টা করে বলল।

"বা রে, কতদিন ধরে যাচ্ছি আসছি—।"

"তুমি খুব কাজের মেয়ে।" অমল হাসল।

অমলের কোটের হাতা ধরে ভ্রমর আলগা একটু টেনে দিল। "ঠাট্টা!"

"ঠাট্টা কি, নিজের চোখেই দেখলাম।" অমল পকেট থেকে সেই জিনিসটা ততক্ষণে বের করে ফেলেছে।

"অন্য অন্য বারে কৃষ্ণা আসে। মা খুব কম। আমায় এই একটা কাজ বরাবর করতে হয়।...ওটা কি?" ভ্রমর অমলের হাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল।

"সিগারেট। আমি একটা সিগারেট খাব।" অমল গলায় জোর দিয়ে ঘোষণা করল।

ভ্রমর যেন স্তম্ভিত। বিশ্বাস করতে পারছিল না। অমলের হাতের দিকে অল্প সময় তাকিয়ে থেকে শেষে চোখ তুলে অমলের মুখ দেখতে লাগল। "কোথায় পেলে? কিনেছ?"

"তখন পান কিনছিলাম-না, দুটো কিনে ফেললাম। দেশলাইও কিনেছি।"

"তুমি সিগারেট খাও?" ভ্রমর অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

"খাই না। আমি স্মোকার নই। তবে দু-চারটে খেয়েছি।" অমল দেশলাইয়ের ওপর খুব কায়দা করে সিগারেট ঠুকতে লাগল। বলল, "আমি প্রথম সিগারেট খাই ফার্স্ট ক্লাসে পড়ার সময়, সরস্বতী পুজোর দিন। আমাদের স্কুলের নিয়ম, যারা টেন ক্লাসে উঠবে, তারা সেবারে সরস্বতী পুজো করবে। আমাদের সময় আমরাই লীডার।...সরস্বতী পুজোর দিন রাত্তির বেলা অমূল্য, ভানু-টানুরা মিলে আমায় সিগারেট খাইয়ে দিল। ওরা খেত মাঝে মাঝে। ওরা সিদ্ধিও খেত। তুমি কখনও সিদ্ধি খেয়েছ?"

"ভাঙ্?"

"হ্যাঁ, ভাঙ্। খাও নি?...আমি খেয়েছি। বিজয়ার দিন একবার দ্বিজনদাদের বাড়িতে সিদ্ধি খেয়ে, ওরে ব্বাস...কী হাসি...হাসতে হাসতে মরে যাই: তুমি যদি কখনও খাও, মনে হবে চলছি ত চলছি, সব ভোঁ-ভোঁ; আর একবার হাসতে শুরু করলে ননস্টপ হেসে যাবে...।" অমল খোলামেলা গলায় হই-হই করে বলে যাচ্ছিল, হাসছিল মহা ফুর্তিতে।

"সিগারেট, ভাঙ, গাঁজা—সব রকম নেশা করেছেন! কী ছেলে—!" ভ্রমর

চোখ বেঁকিয়ে ছোট করে ধমক দিল।

আত্মকথায় অমল এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, সিগারেটটা তার হাতেই ছিল, ধরানো হয় নি। এবার সচেতন হল। সিগারেট ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিল। দিয়ে জিবের জল দিয়ে ডগাটা ভিজিয়ে নিল। একবার ঠোঁটে সিগারেট এ'টে গিয়ে তার ঠোঁট পুড়ে গিয়েছিল। সিগারেট ধরাবার আগে আবার মুখ থেকে সেটা নামিয়ে নিল। বলল, "এই, বাড়িতে কিন্তু কাউকে বলবে না। মেয়েরা বাই-নেচার বড্ড চুগলি কাটে।"

ভ্রমরের খুব হাসি পাচ্ছিল। হাসল না। গম্ভীর মুখ করে বলল, "সরস্বতী পুজোর পর আর সিগারেট খাও নি?"

খেয়েছে বইকি অমল, টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের পর খেয়েছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন খেয়েছে, তারপর ওই রকম সব ফুর্তির দিনে মজা করে খেয়েছে। কলেজেও দু-একটা খেয়েছে কখনও, আনন্দ করে, দলে পড়ে। অমল সেই সব বৃত্তান্ত বলতে লাগল।

টাঙা ততক্ষণে জল-ট্যাঙ্ক ছাড়িয়ে চলে এসেছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা, সাদা সাদা কুয়াশা ঝুলছে রেশমের মতন, আকাশে ফুটফুট করছে চাঁদ। জ্যোৎস্না এবং কুয়াশায় পথ যেন কাশফুলের মতন সাদা ও নরম হয়ে আছে। গাছ-গাছালির গায়ে চাঁদের কিরণ অবিরত সুধা ঢালছে। ঘোড়ার এবং গাড়ির ছায়া পড়েছে রাস্তায়, দীর্ঘ ছায়া, রাস্তা পেরিয়ে মাঠ দিয়ে ছায়াটা ছুটছে। ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বেজে চলেছে ঝুমঝুম করে, মাঝে মাঝে জীবটা ডেকে উঠছে।

অমল ভ্রমরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ভ্রমর অমলকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে। ওদের পায়ে ধবধবে জ্যোৎস্না পড়ে আছে, গাড়ির ছাদ থাকায় মুখ অথবা গা সরাসরি চাঁদের আলো পাচ্ছে না।

অনেকগুলো দেশলাইকাঠি নষ্ট করে অমল শেষ পর্যন্ত সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল। হাতের আঙুলে এবং জিবের জলে সিগারেট চেপটে ভিজে কদাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তেমন ধোঁয়াই আসছে না। ভ্রমরের কাছে কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে অমল সেই বিস্বাদ সিগারেটই জোরে-জোরে টানছিল এবং প্রায়ই কেশে উঠছিল।

ঠাণ্ডা লাগায় ভ্রমর এবার মাথার ওপর স্কার্ফটা বেঁধে নিল। তার কান মাথা এবং গালের অনেকটা ঢাকা পড়ে গেলে অমল তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বারে! তোমায় বিউটিফুল দেখাচ্ছে!"

ভ্রমর কান করল না কথায়। বলল, "সিগারেট ফেলে দাও।"

"ফেলে দেব! বা! পয়সা দিয়ে কিনলাম।"

"খেতে পারছ না, কাশছ, তবু খাচ্ছ।"

"বেশ খেতে পারছি। এখানের সিগারেটগুলো কড়া।...শীতে বেশ জমছে।" বলে অমল বাঁ পকেট থেকে হাত বের করে কোটের কলার তুলে দিল। "ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে কিনা তাই কাশি-কাশি লাগছে।"

টাঙাঅলা এই সময় গুনগুন করে কি সুর ধরল। জলে একসঙ্গে দাঁড় ফেলার মতন শব্দ করে ঘোড়াটা সমস্ত শরীর নাচিয়ে-নাচিয়ে চলছে। না, জলে দাঁড় ফেললে ঠিক এ-রকম শব্দ হয় না, কিন্তু অনেকটা এই রকমই। অমল

ভাবল, কান পেতে শুনল, শুনতে-শুনতে বেশ যেন তন্ময় হল একটু।

ভ্রমর হঠাৎ নজর করে দেখল, তাদের পায়ের তলায় রাস্তা দিয়ে গাড়ির যে ছায়াটা ছুটছে, সেখানে তাদের কোনো চেহারাই নেই। কি ভেবে ভ্রমর একটা হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিল, তবু ছায়া পড়ল না।

মজার গলা করে ভ্রমর বলল, "এই, দেখেছ—"

অমল তাকাল। সিগারেটটা এবার সে নিজের থেকেই ফেলে দিল। জিব তেতো লাগছে, তামাক চলে গেছে মুখে। "কি?" অমল শুধলো।

"দেখছ, আমাদের ছায়াই পড়ছে না।" ভ্রমর হাত বাড়িয়ে পায়ের তলার পথ দেখাল। তার গলার স্বর লঘু চঞ্চল।

অমল দেখল এক পলক রাস্তাটা। বলল, "ডিরেক্ট লাইট ছাড়া কোনো অবজেক্টের শ্যাডো হয় না। আমরা লাইট পাচ্ছি না।" বলে অমল রগড় করে আবার বলল, "ফিজিক্স-টিজিক্স পড়লে না—রদ্দি হোমসাইন্স পড়ে বিদ্যের জাহাজ।"

"ইস্, তুমি কত বিদ্বান!"

"আমি ফিজিক্স পড়েছি। আমাদের কলেজের মধ্যে আমার হায়েস্ট মার্কস ছিল ফিজিক্সে।"

"গর্ব করো না।" ভ্রমর ঠোঁট চেপে হাসছিল।

"গর্ব!...তুমি বিশ্বাস করছ না! আমি প্রমিস করে বলতে পারি।..." অমল সামনের দিকে ঝুঁকে ভ্রমরের গায়ে হাত দিল, যেন এখুনি সে শপথ করে ফেলতে পারে।

ভ্রমর এবার শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "থাক্। তুমি খুব ভাল ছেলে।"

অমল অন্য কথা ভাবছিল। "বুঝলে ভ্রমর, আমার লেখাপড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বি. এস-সি. পাশ করে আমি এম. এস-সি. পড়তাম। আজকাল নিউ-ক্লিয়ার ফিজিক্স পড়তে পারলে তোমার কী খাতির!" অমল আবেগবশে বলল।

"পড়লে না কেন?"

"বাবা! বাবা বললে মেকানিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসসিপ নিতে...। আমারও এমন ব্যাড লাক্, হুট করে অসুখ হয়ে গেল কলেজে ঢুকেই, নয়ত বি. এস-সিটা পড়ে ফেলতাম।" অমলের গলায় প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ ছিল।

ভ্রমর অমলের জন্য সমবেদনা অনুভব করে বলল, "এও ত ভাল। তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে।"

"আমি ঠিক একদিন অফিসার হব।...চেষ্টা করলে মানুষে কি না হয় বল, সে সব পারে।"

টাঙাটা একটা ছোট পল্লী ছাড়িয়ে এবার ধু-ধু ফাঁকায় পড়ল। চারপাশে উঁচু-নীচু মাঠ, দু-চারটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে, আর্দ্র জ্যোৎস্নায় চরাচর যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘোড়ার গলার ঘণ্টাটি ঝুমঝুম করে বেজে যাচ্ছে, কদমের শব্দ এবং চাকার শব্দ মিলে-মিশে একটি অদ্ভুত ধ্বনি বিস্তার করেছে, কোচো-আন তার গানটি গেয়ে যাচ্ছিল আপন মনে। রাস্তার পাশের দেবদারু গাছ শীতের বাতাসে কেমন শব্দ করছিল মাঝে মাঝে।

ওরা দুজনেই নীরব হয়ে বসে থাকল। এবং দুজনেই মাঠ-ঘাট ও জ্যোৎস্না দেখছিল।

"আমাদের গাড়িঅলা কি গান গাইছে ভ্রমর?" অমল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।
"দোহা।"
"শুনেছি কথাটা...। এক রকম গান, না—?"
"হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু ছিল আগে, আরতি গুপ্তা। সে গাইত, খুব সুন্দর গাইত। আরতিরা মিরাট চলে গেছে।"
অমল শীতের বাতাসে কেঁপে উঠল একটু। গরম কোটের কলার আরও ঘন করে গলায় জড়াল। বলল, "তুমি একটা গান গাও।"
"যাঃ!" ভ্রমর ভ্রূকুটি করল।
"যা কেন, গাও। শীত-টীত উড়ে যাবে।"
"রাস্তায় কেউ চেঁচিয়ে গান গায়?"
"কেন গাইবে না! গান হচ্ছে, কি যেন, আনন্দ। আনন্দ হলেই গায়। ও গাইছে কি করে!"
"ও দুঃখের গান গাইছে।" ভ্রমর মৃদু গলায় বলল। "ও কি বলছে জান? বলছে, আমার সারাটা দিন ক্ষেতীতে মাটি কেটে লাঙল দিয়ে কাটে, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলে বাড়ির লোক জিজ্ঞেস করে, আজ কতটা লাঙল দেওয়া হল? হায় ভগবান, আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে না—তোমার ভজন-পূজন কতটুকু করলাম।"
অমল নীরবে কথাগুলো শুনল। ঘাড় ফিরিয়ে কোচোআনকে দেখল দু-দণ্ড। তারপর বলল, "ভ্রমর, সব সময় দুঃখ আমার ভাল লাগে না।"
ভ্রমর কিছু বলল না। সে সামনের জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকল।
চুপচাপ কয়েক দণ্ড বসে থেকে অমল খুব অস্বস্তি বোধ করল। এবং অস্বস্তি কাটাতেই যেন তার অবশিষ্ট সিগারেটটা বের করল। এমনও হতে পারে যে এই দ্বিতীয় সিগারেটটা পকেটে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে চায় না সে। এবারে খুব সাবধানে তিনটে কাঠিতেই অমল সিগারেট ধরাতে পারল। তারপর আস্তে-আস্তে টান দিল। সে আর কাশবে না।
অমলকে দেখল ভ্রমর। কিছু বলল না।
অমল বলল, "কই, একটা গান গাও! কী বিউটিফুল দেখাচ্ছে বলো ত! জ্যোৎস্না ধবধব করছে। তোমার ভাল লাগছে না?"
এক পাশে মাথা হেলালো ভ্রমর। তার ভাল লাগছে?
"তা হলে একটা গান গাও। ভাল লাগাই লাইফ।" অমল সানন্দে বলল।
"তুমি গাও।"
"আমি!...বেশ, আমি গাইছি। তুমিও গাইবে। একসঙ্গে গাইব আমরা।"
ভ্রমরের চোখের পাতায় আবার হাসি ফুটল। ঠোঁট দুটি আভা পেল।
গান বেছে নিতে একটু সময় লাগল অমলের। সে যেটা জানে ভ্রমর জানে না; ভ্রমর যা জানে অমল জানে না। শেষে অমল একটা পুরনো দুজনেরই জানা গান বেছে নিল। সিগারেটটা ফেলে দিল, আধখানাও খাওয়া হয়নি। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে-ই প্রথম গানের কলি ধরল : "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর..."
প্রায় অর্ধেকটা গান অমল একা গেয়ে ফেলার পর ভ্রমর তার শেষ সঙ্কোচ এবং আড়ষ্টতাটুকু হারিয়ে ফেলে অমলের গলায় গলা মিলিয়ে গাইল : "এই

তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত, এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত...”

কোচোআন গান আর গাইছিল না। ঘোড়ার কদম ফেলার তালে তালে তার গলার ঘণ্টা ঝুমঝুম ঝুমঝুম করে বেজে যাচ্ছিল। জ্যোৎস্নার কণাগুলি মাঠ ও বৃক্ষচয় থেকে তাদের চক্ষু তুলে যেন ওই দুটি আনন্দিত তৃপ্ত যুবক-যুবতীকে দেখছিল।

গান শেষ হলে দুজনেই নীরবে বসে থাকল।

গাড়িটা বাড়ির কাছে এসে গেছে। অমল রুমাল বের করে যখন নাক মুছছিল, তখন তার হাতে সিগারেটের গন্ধ পেল। তার সন্দেহ হল, মুখে সিগারেটের গন্ধ আছে।

“এই, দেখ ত আমার মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে কিনা!” অমল বলল, বলে ভ্রমরের মুখের সামনে ঝুঁকে মুখ হাঁ করল।

ভ্রমর মুখ আনল অমলের মুখের কাছে। লম্বা করে নিশ্বাস নিল। সিগারেটের গন্ধ পেল যেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তামাকের ফিকে গন্ধ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়ে ভ্রমর তার ঘ্রাণ-চেতনায় অদ্ভুত একটি গন্ধ অনুভব করতে পারল। অমল মুখ হাঁ করেই ছিল, ভ্রমরের মুখ অমলের মুখের অত্যন্ত নিকটে, তার নাক অমলের ওষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে আছে। ভ্রমর দ্বিতীয়বার নিশ্বাস নিল, অত্যন্ত ধীরে-ধীরে, তার মনে হল, অমলের মুখ গলা বুক থেকে এমন একটি সুগন্ধ আসছে, যা সে আর কখনও কোথাও অনুভব করে নি। ভ্রমরের সমস্ত মুখ উষ্ণ হয়ে উঠছিল, চোখের কোণ জ্বালা করছিল, ঠোঁট দুটি কম্পিত হবার মতন সঙ্কুচিত হল ঈষৎ, তারপর ভ্রমর আর কিছু অনুভব করতে পারল না, কোনো সুখকর জীবন্ত মাদকতা ভরা ঘ্রাণ তার চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অমল মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, “কী হল, গন্ধ আছে?”

৫

অনেকটা রাত হয়ে এসেছিল। এ-বাড়ি নিস্তব্ধ, নিঝুম। নিবিড় নীরবতার মধ্যে ভ্রমর জেগে ছিল।

কৃষ্ণা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে তার ঘন ভরা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ভ্রমর স্থির ও শান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে। সে কখনও চোখের পাতা বন্ধ করছিল, কখনও চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে ছিল।

বাইরে শীতের অস্থির হাওয়া বইছিল আজ, কান পাতলে হুহু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কদাচিৎ একটি-দুটি শীতার্ত পাখি ডেকে উঠছিল। পুঞ্জীভূত কুয়াশা এবং শীতল আর্দ্র জ্যোৎস্না ভ্রমর দেখতে পাচ্ছিল না। জানলার খড়খড়ি ও শার্সি বন্ধ। ভেন্টিলেটারের গর্ত-দিয়ে-আসা আলোর একটু আভা সিলিঙের কাছে ঝুলে আছে।

গলা পর্যন্ত লেপ টেনে ভ্রমর এই স্তব্ধতা ও সুপ্তির মধ্যে জেগে ছিল। তার ঘুম আসছে না, ঘুম না আসায় সে বিরক্ত বা অপ্রসন্নতা বোধ করছে না। কোনো নির্জন স্থানে বসে মানুষ যেমন অতিবিস্তৃত মনোরম ও রহস্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে, ভ্রমরও এই অন্ধকারে যেন সেই রকম কোনো দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল।

চকবাজার থেকে বাড়িতে ফেরার পরই ভ্রমর খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ঠিক এই ধরনের চাঞ্চল্য সে আর কখনও অনুভব করে নি। এলোমেলো বাতাসের মতন তার মন নানাদিকে ছুটে যাচ্ছে : কখনও জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে তাদের টাঙাগাড়ি ছুটে আসা দেখছে, কখনও অমলকে সিগারেট ধরাতে দেখছে, কখনও সেই পথে-গাওয়া গানটি তার কানের কাছে নিঃশব্দে যেন গাওয়া হচ্ছে; কখনো বা ভ্রমর অমলের মুখের গন্ধটি স্মৃতি থেকে বার বার অনুভব করার চেষ্টা করছিল।

আজ এ-রকম কেন হল ভ্রমর বুঝতে পারছিল না। টাঙা থেকে নামার পর সে কেমন বেহুঁশ ছিল, এত বেহুঁশ যে আয়াকে হিমানী-মা মনে করে কি একটা কথা বলে ফেলেছিল। সে ভাল করে কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। বাজারের হিসাব মেলাতে ক'বারই ভুল হয়ে যাওয়ায় সে কৃষ্ণাকে যোগটা করে দিতে বলে পোশাক বদলাতে লাগল। পোশাক বদলানোর সময় গায়ের জামায় সে গন্ধ শুঁকেছিল। ভ্রমর কিসের গন্ধ পেতে চাইছিল সে নিজেও জানে না। কোনো রকম গন্ধ সে পায় নি; না পেয়ে মন খারাপ লাগছিল। তারপর ভ্রমর তার শারীরিক অনুভূতিগুলি বোধ করতে পারল। তার কপাল এবং কান গরম, চোখের মণিতে জ্বালা জ্বালা ভাব, সর্দিজ্বরের মতন সর্বাঙ্গে কেমন

শীত-শীত লাগছিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস উষ্ণ, বুকের মধ্যে কখনও খুব ফাঁকা লাগছিল, কখনও খুব ভরা ভরা লাগছিল।

এলোমেলো মন, কেমন আশ্চর্য এক জড়তা এবং চাপা অস্থিরতার মধ্যে বাকি সময়টুকু কেটে গেল। অমলের সঙ্গে একটি কথাও আর সে বলে নি, খাবার টেবিলে চুপ করে ছিল, নীচু মুখে বসে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল, মুখ তুললে সে সকলের কাছে ধরা পড়ে যাবে।

শুতে এসে কৃষ্ণা মুখে হাতে গলায় ক্রীম মাখার সময় পুষ্পার শীঘ্রি বিয়ে হবে এই খবরটা দিল। ভ্রমর কান করে কথাটা শুনল না। ভ্রমর অন্য অন্য দিনের মতন রাত্রের ক্রীমও মাখল না। তার ভাল লাগল না। ক্রীমের গন্ধ যে মানুষের মুখের স্বাভাবিক সুন্দর গন্ধ নয়, ভ্রমর আজ তীব্র ভাবে অনুভব করছিল।

তারপর ঘর অন্ধকার করে, বেড়ালটাকে পায়ের দিকে সরিয়ে দিয়ে ভ্রমর শুয়েছে। তখন থেকে সে শুয়েই আছে। ঘুমোবার কথা একবারও ভাবে নি, রাত্রি এবং সময়ের কথাও তার খেয়াল হচ্ছিল না।

ছেলেবেলায় ভ্রমর তার কয়েকটি পুতুল, কিছু রঙীন ছিট কাপড়, ভাঙা চিরুনি, কাচের চুড়ির টুকরো নিয়ে একা একা সারাবেলা কাটাত। বড় হয়েও তার স্বভাব খুব একটা বদলায় নি। এখনও ভ্রমর খুব তুচ্ছ সামান্য কিছু নিয়ে নিজের মনে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে। আজ রাত্রে সে কয়েকটি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছবি, বিবিধ চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

অমল এ-বাড়িতে এল যেদিন সেদিনের ছবিটি ভ্রমর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। বাবার সঙ্গে টাঙা থেকে নামল অমল, তখন একেবারে সাত সকাল, আলো ফুটেছে সবে, ঘাসের মাথা হিমের গুঁড়োয় সাদা হয়ে আছে তখনও। গাড়ি থেকে নেমে অমল গোবেচারীর মতন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ধুলোয় ভস্ম, কয়লার গুঁড়োয় কালো, শুকনো, রুক্ষ চেহারা। ভ্রমর এবং হিমানী-মা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অমলকে দেখে সেই সকালে বড় মায়া হয়েছিল ভ্রমরের। খুব কষ্ট পেয়েছে আসতে। মনে মনে অবশ্য সকৌতুক একটু হাসিও পাচ্ছিল। এই তবে অমল! ভ্রমর ভেবেছিল, আরও বড় হবে, লম্বা হবে, গোলগাল চেহারা হবে, গোঁফ থাকবে, দাড়ি কামানো মুখ হবে। কিন্তু দেখে মনে হল, সে-সবের কিচ্ছু নেই। একেবারে ছেলেছোকরা। ছিপছিপে গড়ন, পাতলা একটু গোঁফ, ভালো করে দাড়ি ওঠে নি। চোখে চশমাও নেই।

হিমানী-মাই চা তৈরী করে খাওয়ালে, ভ্রমর গেল অমলের গোছানো ঘর আরও একবার গুছিয়ে স্নানের গরম জল করে দিতে, সাবান তোয়ালে রাখতে।

সেদিন ভ্রমর মনে-মনে বেশ অবাকও হচ্ছিল। মা যখন বেঁচে ছিল, ভ্রমর একেবারে বাচ্চা, বছর চার বয়েস, তখন একবার বাবার সঙ্গে বাঁকুড়ায় গিয়েছিল। বাঁকুড়া থেকে ফেরার পথে তারা রমামাসির বাড়ি হয়ে ফিরেছিল। ভ্রমরের সে-সব কথা একেবারে মনে নেই, শুধু মনে আছে, একটা ফরসা গোলগাল ছেলে তাকে হাত ধরে কাঠের ঘোড়ায় চাপাত এবং দোলাত। বলত, মন্ত্র পড়ে দিলে এই ঘোড়াটা উড়ে আকাশে চলে যেতে পারে, কিন্তু সে মন্ত্র পড়বে না, কেননা আকাশে চলে গেলে ঘোড়াটা আর ফিরে আসবে না। ভ্রমর অবশ্য তখন সে-কথা বিশ্বাস করেছিল কি না, আজ আর তার মনে পড়ে না।

অমল কিন্তু কিছুতেই সে-কথা স্বীকার করতে চাইল না। তাদের বাড়িতে একটা ঘোড়া ছিল ঠিকই, তবে সেটা ঠুঁটো জগন্নাথ বলে তারা ঘোড়াটা গুদোম-ঘরে ফেলে দিয়েছিল। অমলের বয়স তখন ভ্রমরের চেয়ে বেশী ছিল, তবু তার পুরনো কথা কিছু মনে নেই। সে শুধু মেসোমশাইয়ের কথাটা মনে করতে পারে সামান্য। কেননা তাকে সকলে বলেছিল, মেসোমশাই খুব বিদ্বান, কলেজে পড়ান। বিদ্বান লোক দেখার আগ্রহে সে মেসোমশাইকে খুব নজর করে দেখত।

বাবা তার পরও বার দুই দেশের দিকে গিয়েছে। একবার একলা, ভ্রমর ছিল মামার বাড়িতে। সেবারও বাবা রমামাসিদের বাড়ি হয়ে ফিরেছিল। হিমানী-মাকে এবং কৃষ্ণাকে নিয়ে বাবা আবার যখন দেশে যায় তখন ভ্রমরও সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেবার তারা রমামাসিদের বাড়ি হয়ে ফেরে নি।

প্রথম দিন অমলকে যেমন দেখিয়েছিল, অমল কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। একেবারে নতুন বলে মাত্র একটা বেলা মুখ বুজে বোবা-বোবা হয়ে থাকল। বিকেল থেকেই তার মুখ ফুটল অল্প। ভ্রমরকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল।—এখানে এত সাইকেল কেন? টমটম আর টাঙায় তফাতটা কি? এখানে ক'টা স্কুল? ক'টা কলেজ? এখানে কি-রকম করে হিন্দী বলে অমল বুঝতে পারে না, তাদের দিকে হিন্দী একেবারে সোজা।

একেবারে নতুন জামা যেমন প্রথম-প্রথম গায়ের সঙ্গে মিশ খায় না, একটু আড়ষ্ট লাগে, অমলকে মাত্র দুটো দিন সেই রকম লেগেছিল, নতুন-নতুন এবং বাইরের মনে হচ্ছিল, তারপর আর লাগল না। লাগতে দিল না। খুব সহজে, একেবারে এ-বাড়ির একজনের মতন করে মিশে গেল। বরং ভ্রমরের মনে হল, এ-বাড়ির আর তিনজনের চেয়ে অমল অনেক বেশী, অনেক নিকট আত্মীয় হয়ে তার সঙ্গে মিশে গেছে। অমলকে ভ্রমরের প্রথম-প্রথম ভাল লাগত এই জন্যে যে, যেন অমল তার মা, তাদের নিজেদের দেশ, ফেলে-আসা ভুলে-যাওয়া আত্মীয়স্বজনের জগৎ থেকে এখানে এসে গেছে হঠাৎ। সেখানকার কত কথা, যা ভ্রমর জানে না, সেখানকার অনেক গল্প, যা ভ্রমর কোনোদিন শোনে নি, বহু আচার-আচরণ হাবভাব যা এ-প্রবাসে তারা দেখে নি—অমলের কাছ থেকে সেই সব জানতে শুনতে ও দেখতে পেয়ে ভ্রমর যেন একটি উত্তরাধিকার খুঁজে পাচ্ছিল। আত্মীয়সম সেই জগতটি অনুভব করার জন্যে ভ্রমর অমলকে নিবিড় করে লক্ষ করত, তার কথাবার্তা শুনত, গল্প করত।

অমলকে মনে মনে খুব পছন্দ করছিল যখন, তখনই ভ্রমর অনুভব করল, ওই ছটফটে হাসিখুশী চমৎকার স্বভাবের ছেলেটি তার সঙ্গীর মতন হয়ে গেছে। ওকে বন্ধুর মতন লাগল। ভ্রমরের কখনও কোনো সত্যিকারের বন্ধু ছিল না, নেইও। অমলকে বন্ধুর মতন সুন্দর ও নিবিড় লাগল। তারপরই ভ্রমর অনুভব করল, তার জন্যে খুব মায়া অমলের, কত মমতা! ভ্রমরের দুঃখ-কষ্টে অমল কষ্ট পায়, ভ্রমরের জন্যে উদ্বেগ বোধ করে। একদিন ভ্রমর রাস্তায় বেরিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, মুখ থুবড়ে পড়ে যেত, অমল ধরে ফেলেছিল; তার-পর থেকে অমল এত সাবধানী হয়েছে যে, রাস্তায় সব সময়ে ভ্রমরের পাশে-পাশে থাকে, একটু উঁচু-নীচু জায়গা হলেই হাত ধরে।...জ্বর হবার কথা এবং অন্য আরও অনেক কথা ভ্রমর মনে করতে লাগল। অমল সব সময় ভ্রমরের

জন্যে উতলা ও অধীর কেন?

ভ্রমর আজ শুয়ে-শুয়ে অমলের এই মায়া মমতা ও করুণার কথা ভাবছিল। মনে হচ্ছিল, এতদিন সে যেন বাইবেলের সেই ডুমুর গাছ হয়ে ছিল। অফলা ডুমুর গাছ। একটি ফল ফলত না কোনোদিন। তাকে হিমানী-মা'রা হয়ত কেটে ফেলত। কিন্তু অমল এসে তার চারধার খুঁড়ে যেন সার দিয়ে দিয়েছে।

নিজেকে ফলন্ত ডুমুর গাছের মতন কল্পনা করল ভ্রমর। সে ডুমুর গাছ চিনত না। তবু নিজেকে ফলন্ত অনুভব করে তার ভাল লাগছিল।

কৃষ্ণার বিছানার দিকে শব্দ হল। ঘুমের ঘোরে কৃষ্ণা উঠে বসে আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল, লোহার খাটের স্প্রিঙে শব্দ হল, বিড়বিড় করে কি যেন বলল কৃষ্ণা, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা, তারপর আবার অকাতরে ঘুমোতে লাগল।

ভ্রমর অন্ধকারে কৃষ্ণার বিছানার দিকে তাকাল। এই ঘন স্তব্ধতা ও রাত্রি, সময় ও ঘুমের কথা তার এবার খেয়াল হল। কতটা রাত হয়েছে বোঝা যায় না। বোধ হয় মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। গায়ের লেপ আরও ঘন করে জড়িয়ে নিল ভ্রমর। বুকের ওপর হাত রেখে শুয়ে থাকল।

শুয়ে থাকতে-থাকতে ভ্রমর চোখের পাতা বন্ধ করল। হঠাৎ মনে হল, ওর চোখের ওপর জ্যোৎস্নার আলো এসেছে, নির্মল আলো। সেই আলোর মধ্যে অমল বসে আছে। অনেকটা দূরে। একলা। অমলকে অতটা দূরে থাকতে দেখে ভ্রমর হেঁটে-হেঁটে তার কাছে যাচ্ছিল ত যাচ্ছিলই। এমন সময় সে নিজের খোঁড়া পায়ে ব্যথা অনুভব করল। এবং ভাবল, অতটা পথ সে কি করে এগিয়ে গিয়ে অমলকে ডাকবে। নিজের পায়ের জন্যে ভ্রমরের বড় দুঃখ হল।

'ভ্রমর, তোমার সব সময় যদি অসুখ হয় তুমি বাঁচবে কি করে?'—অমলের এই কথা যেন তার কানের কাছে বাজল; ম্লান বিষণ্ণ কাতর স্বরে অমল এই মুহূর্তে কথাটা আবার বলল। ভ্রমর দেখল, তার চোখেব সামনে জ্যোৎস্নার আলো আর নেই।

বাঁচার কথা ভাবতে গিয়ে ভ্রমর আবার মা'র কথা ভাবল। মা অসুখের ধাত পেয়েছিল বলে বাঁচে নি। মা'র মুখে কোনোদিন হাসি ফোটে নি। কিন্তু এই অসুখ মা'র কোথায় ছিল ভ্রমর জানে। ভ্রমর বড় হয়ে সব অনুমান করতে পেরেছে। মা সংসারে ভালবাসা পায় নি। কেন পায় নি ভ্রমর জানে না। বোধ হয় এই জন্যে যে, মাকে তাদের সমাজ পতিত ভাবত; বাবা ঝোঁকের বশে মাকে বিয়ে করার পর নানাভাবে হেয় হয়েছিলেন, তাঁকে কেউ সাহায্য করে নি; বাবা ক্যাথলিক কোনো কলেজে চাকরি পান নি তখন; পেটের দায়ে বিদেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। হয়ত বাবাও শেষ পর্যন্ত মা'র ওপর বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত মা নিজেকে বরাবর দীন ও পাপীতাপী মনে করত। ভ্রমর ঠিক জানে না।

আজ ভ্রমর অনুভব করল, সে তার মা'র মতন মরে যেতে চায় না। বাঁচার আগ্রহ তাকে অস্থির করছিল। সে ফলন্ত ডুমুরগাছ হতে চায়। ঈশ্বরের কাছে ভ্রমর প্রার্থনা করল, প্রার্থনা করল।

খুব নরম হাতে ভ্রমর গলার হারে গাঁথা ক্রুশটি স্পর্শ করল, মুঠোয় ধরে থাকল। সে আশ্বাস এবং নির্ভরতা চাইছিল। সে বেঁচে থাকার জন্য প্রভুর দয়া প্রার্থনা করছিল।

তার এ-সময় হঠাৎ মনে হল, ভালবাসাই মানুষকে বাঁচায়। যে-অন্ধজন,

যে-কুষ্ঠরোগী এবং অন্য যারা যীশুর কৃপায় আরোগ্যলাভ করেছিল, তারা তাঁর ভালবাসার বলে অসুখ থেকে উদ্ধার পেয়েছিল। ভালবাসাই আরোগ্য; বিশ্বাস এবং ভালবাসাই সব। ভ্রমর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাইল, সে এই অ-সুখ থেকে উদ্ধার পাবে, এবং বিড়বিড় করে ভ্রমর বলল : ভয় পেয়ো না, বিশ্বাস কর।

ভালবাসার চিন্তা ভ্রমরের কাছে নতুন লাগছিল। সে যখন মুঠো খুলে তার হাতটি বুকে রাখল আবার, তখন মনে হল, তার বুকের তলা চোখের পাতার মতন কাঁপছে। কোন অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় থেকে একটি উষ্ণতা তার সমস্ত চেতনাকে উষ্ণ ও আকুল করছে।

অনেকক্ষণ ভ্রমর অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। তার হৃদয় দুলন্ত দোলনার পিঁড়ির মতন দুলছিল, কখনও হর্ষে কখনও বিষাদে যাচ্ছিল। অবশেষে মুখ হাঁ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভ্রমর, পাশ ফিরে শুলো। পাশ ফিরতে গিয়ে বুঝতে পারল তার গাল ভিজে গেছে।

ভ্রমর কেন কাঁদছে, সে-কথা সে ভাবল না। বরং এই অশ্রু তাকে আরও নিবিড় করে নিজের কথা ও অমলের কথা ভাবাচ্ছিল, সে আজ এত কথা ভাবছিল, কেননা ভ্রমর অমলের সেই মুখের গন্ধ ভুলতে পারছিল না। ওই গন্ধের আশ্চর্য চেতনা তাকে হয় পথভ্রান্ত করেছে, সে মরীচিকা দর্শন করেছে, না-হয় ভ্রমর আজ নিজেকে ঐশ্বর্যসম্পন্ন যুবতী মনে করছিল।

সে এক রকম অদ্ভুত স্বাধীনতাও বোধ করতে পারছিল, যেন তার সামনে থেকে কোনো বিশ্রী জেলখানার শক্ত কঠিন এবং ঘৃণ্য লোহার গরাদ এক একটি করে কেউ ভেঙে দিয়েছে, বা খুলে নিয়ে গেছে। সব এখন উন্মুক্ত, তার সামনে সমস্ত কিছুই অবারিত। অনেকক্ষণ এই অবিশ্বাস্য মুক্তি ভ্রমর অনুভব করতে পারে নি, খাঁচায়-পোরা পাখির মতন সে তার ডানাকে গুটিয়ে রেখে বসেছিল, তারপর কখন এক সময় বিমূঢ় ও বিহ্বল ভাব কেটে গেলে অত্যন্ত আচমকা ভ্রমর দেখল, সে মুক্তি পেয়েছে।

প্রথমে আড়ষ্ট পায়ে, ভয়ে-ভয়ে ভ্রমর তার জেলখানা থেকে বেরিয়ে এল যেন। দেখল, অমল তার সামনে। অমলকে কতক্ষণ দেখার পরও সাধ মিটল না। জীবনে এমন একজন আছে তবে যাকে দেখে-দেখে সাধ মেটে না! কী ইচ্ছেই করতে লাগল অমলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে। মনে হচ্ছিল, অমলের চোখের মধ্যে বুকের মধ্যে মিশে গিয়ে অশরীরী অবস্থায় সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখে।

নিজের অস্তিত্ব হারাবার জন্যে ভ্রমর এই প্রথম আকুল হল, সে কাতর হয়ে অমলের মনের পাশে গিয়ে বসতে চাইল; যে-চোখে অমল দেখছে, যে-মনে অমল ভাবছে, যে-স্বভাব নিয়ে অমল এত সুন্দর—ভ্রমর সেই চোখ মন স্বভাব সবকিছুর অংশীদার হতে চাইছিল। একজন মানুষ কখনও অন্য একজন মানুষের মধ্যে গিয়ে মিশে যেতে পারে না। যদি পারত, ভ্রমর হতাশ হয়ে এবং আক্ষেপ করেই ভাবছিল, যদি সে অমলের মনের মধ্যে ডুবে যেতে পারত, ওর সবকিছুর সঙ্গে মিশে যেতে পারত তবে সে ধন্য ও পূর্ণ হত!

খাঁচার দরজা খুলে গিয়েছিল বলে, এবং ভয়ে-ভয়ে বাইরে এসে ভ্রমর তার মুক্তি অনুভব করতে পারল বলেই পাখির মতন তার ডানা ঝাপটে শূন্যে ঝাঁপ

দিল। অনভ্যাসবশে সে বেশী উড়ল না, বেশী দূরে যেতে সাহস করল না। যতটকু এগিয়ে গেল, ততটুকুতেই সে আজ গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি পেল, রোমাঞ্চ ও রহস্য অনুভব করল।

অনেকক্ষণ ভ্রমর তার আবেগগুলিকে কুণ্ডলী করে এইসব কথা ভাবল, বহু সময় সে অমলের সেই মুখের গন্ধ নিজের চেতনায় কখনও ফিকে কখনও উগ্রভাবে অনুভব করল; তারপর একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ভ্রমর গায়ে অল্প-অল্প জ্বর নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল। তার চোখ ছলছল করছিল, মাথা ধরে ছিল. মুখ একটু শুকনো। ভ্রমর খুব সাবধানে থাকল। সে চাইছিল না তার জ্বর বাড়ুক। ঘরে স্যারিডন ছিল, লুকিয়ে ভ্রমর একটা বড়ি খেল। স্নান করল না, গরম জলে গা মুছে নিল। আজ সে গির্জায় যাবে, গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবে। সে নিজের জন্যে এবং অমলের জন্যে আজ কি প্রার্থনা করবে তাও যেন ভেবে রেখেছিল।

জ্বরটা ঠিক গায়ের না গতরাত্রের অস্থিরতার জন্যে, ভ্রমর ঠিক বুঝতে পারল না। সারাটা বেলা তার গায়ে মাঝে মাঝে কাঁটা দিল, কখনও কখনও কপাল বেশ গরম লাগল, এবং ভ্রমরের মনে প্রতিবারই এই চিন্তা এল যে, তার শরীর খারাপ থাকবে না, সেরে যাবে।

দুপুরবেলায় বেশ শীত লাগছিল। ঘরের মধ্যে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ভ্রমরের। হাত-পা ঠাণ্ডা কনকন করছিল। কৃষ্ণা বারান্দায় রোদে গিয়ে বসে অ্যানুয়েল পরীক্ষার পড়া করছে। দেখতে-দেখতে দুটো বেজে গেল। আর কিছুক্ষণ পরেই চুল বাঁধা, পোশাক বদলানোর তাড়া দেবে হিমানী-মা। চারটে নাগাদ গির্জায় বেরুবে সকলে।

ভ্রমর ঘরে থাকার সাহস পেল না। এই শীত ভাবটা যদি আরও বাড়ে তবে জ্বর আসবে। গায়ে চাদর জড়িয়ে ভ্রমর রোদে গিয়ে দাঁড়াল, রোদ থেকে একসময় পা-পা করে কলাগাছের ঝোপের সামনে, অমলের কাছে।

অমল আজ আর বাইবেল পড়ছিল না। আনন্দমোহন তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে আজ সকালে পুরনো বাংলা মাসিকপত্রের বাঁধানো খণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্র আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী কিছু দিয়েছেন। তারই একটা হাতে নিয়ে অমল দুপুরে রোদে শুয়ে-শুয়ে পড়ছিল।

ভ্রমরকে দেখে অমল বই বন্ধ করল। বলল, "রত্নদীপ পড়ছি।" বলে হাসল।

ভ্রমর কিছু বলল না। সে সারা গা রোদে রেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

"তুমি রত্নদীপ পড়েছ?" অমল শুধলো।

"না।" ভ্রমর মাথা নাড়ল।

"জমাট বই, খুব ভাল লাগছে। আমার হয়ে যাক, তোমায় দেব।"

ভ্রমর বইয়ের কথা ভাবছিল না। আজ সকাল থেকেই সে অমলের কাছাকাছি থাকছে না। ইচ্ছে করছিল সারাক্ষণই, তবু কাছে আসতে পারছিল না। লজ্জা, নাকি ভয়, ভ্রমর নিজেও বুঝতে পারে নি।

"মেসোমশাইয়ের আলমারিতে অনেক বই আছে, ভাল ভাল বই। তুমি পড় না কেন?" অমল শুধলো।

"পড়েছি—" ভ্রমর অন্যমনস্ক ছিল বলে জবাবটা বোকার মতন হল।

"স-ব?"

"সব! না, সব নয়; পড়েছি ক'টা।" ভ্রমর অমলকে দেখল। দেখে বারান্দার দিকে তাকাল। কৃষ্ণা বসে বসে কখনও বই মুখে পড়ছে, কখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সামান্য চুপচাপ। অমল হাই তুলল শব্দ করে। পা টান করল, হাত সামনে ছড়িয়ে আলস্য ভাঙল। বলল, "আজ বিকেলে কি করব তাই ভাবছি। রোববার দিন বিকেলটা একেবারে কাটতে চায় না।"

ভ্রমর অমলের দিকে তাকাল। কষ্ট হবারই কথা, একা একা সারা বিকেল সন্ধে কাটানো! গত রবিবার অমল লীলাদের বাড়ি গিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলেছিল, তার আগের রবিবার একলা একলা ঘুরে বেড়িয়েছে। তারও আগের এই দিনটায় অবশ্য ভ্রমর বাড়িতে জ্বর গায়ে শুয়ে থাকায় অমল একা ছিল না।

"লীলাদের বাড়িতে চলে যেও—।" ভ্রমর বলল। রোদে মাথা রেখে ভ্রমর আঙুল দিয়ে তার শুকনো এলো চুলের জট ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। রোদের তাত লাগছিল ঘাড়ে, বেশ আরাম পাচ্ছিল ভ্রমর।

অমল মাথা উঁচু করে ভ্রমরকে দেখল। বলল, "হ্যাত্, লীলাদের বাড়িতে সব ক'টা মেয়ে, ওদের সঙ্গে আমি কি খেলব!"

খুব সহজেই অমলের আপত্তিটা বুঝতে পারল ভ্রমর। অমলই বলেছিল তাকে। হেসে ফেলে ভ্রমর বলল, "হেরে গিয়ে রাগ!"

"রাগ!...রাগ নয়; মুখ থাকে না, বুঝলে না। লীলা দুর্দান্ত খেলে, আমি পারি না। আমার প্র্যাকটিস নেই।" বলে অমল তার নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজেই কৌতুক অনুভব করে হাসল। কি ভেবে একটু পরে বলল, "এখানে আসার পর পরই একদিন ওই বাগানে খেলেছিলাম, তোমার মনে আছে? সেবার কিন্তু ড্র করেছিলাম।"

ভ্রমরের বসতে ইচ্ছে করছিল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাকে দেখল কয়েক পলক। কৃষ্ণা হাঁ করে বাড়ির ফটকের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি দেখছে কে জানে! মাথার চুল ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকের ওপর আনল ভ্রমর।

"আমি ভাবছি আজ বিকেলেও বাজারের দিকে চলে যাব।" অমল বলল।

চুলের আগা থেকে জট ছাড়িয়ে, কিছু উঠে-আসা চুল হাতের আঙুলে নিয়ে জড় করছিল ভ্রমর। আজকাল তার ভীষণ চুল ওঠে। ময়লাটা ফেলে দিল।

"বাজারে গিয়ে কি করবে?" ভ্রমর শুধলো।

"এমনি। ঘুরে বেড়াব খানিক।" বলতে-বলতে কি যেন মনে পড়ল অমলের, "কাল যেন আমরা কি সিনেমা হচ্ছে দেখলাম, ভ্রমর? রাজাটাজা দেখলাম যে!"

ভ্রমর তেমন খেয়াল করে দেখে নি। বলল, "কি জানি! আমি দেখি নি।.. বাজারে গিয়ে বায়োস্কোপ দেখবে?"

"দেখলে হয়।"

"যাঃ।" ভুরু কুঁচকে ছোট্ট করে যেন ভর্ৎসনা করল ভ্রমর। "বাজার বেড়িয়ে বায়োস্কোপ দেখে সময় কাটানো আবার কি! তুমি বরং..." ভ্রমর কথাটা শেষ করতে পারল না। সে ভেবে পেল না অমলকে কোন পরামর্শটা দেওয়া যায়।

ভ্রমর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছে দেখে অমল ভাবল তাকে বারান্দা থেকে

একটা চেয়ার এনে দেয়। বলল, "তুমি বসো, আমি একটা চেয়ার টেনে আনি।"

ভ্রমর চেয়ার আনতে দিল না। বলল, "আমি মাটিতে বসছি।" বলে মাটিতে বড়-বড় ঘাসের ওপর ভ্রমর বসল, হাঁটু ভেঙে, পা ছড়িয়ে, গোড়ালিতে ভর রেখে।

অমল আবার হাই তুলল। দুপুরটা এবার পড়ার মুখে হেলে গেছে। রোদের তাত নিবে আসছে; শীতের বিকেল যেন সামান্য দূরে পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কলাগাছের ওপরে লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েছে। অমল কয়েক মুহূর্ত মরে-আসা দুপুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি করতে বলছিলে?"

কি করতে বলবে ভ্রমর বুঝে উঠতে পারে নি বলেই চুপ করে গিয়েছিল। অমলের কথায় আবার একটু ভাবল। বলল, "এদিক ওদিক থেকে বেড়িয়ে এস। কতটুকু আর বিকেল! সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরে গল্পের বইটই পড়। তারপরই আমরা এসে যাচ্ছি।"

"থাক!" অমল হাত তুলে মজার একটা ভঙ্গি করে বাধা দিল। "বলতে সব জিনিসই সোজা; তুমি একটু বইটই পড়, আমরা এসে যাচ্ছি ..যেন তোমরা এই যাবে আর এই আসবে! বাব্বা, সেই রাত আটটা-টাটটা পর্যন্ত একলা বসে থাকা...। আমি ত দেখছি ক'হপ্তা।"

ভ্রমর মজার চোখ করে অমলকে দেখছিল। আলস্যের খুব পাতলা ছায়া তার মুখে মাখানো আছে, মাথার ওপর কুটো পড়েছে গাছ থেকে. সিঁথি ভেঙে গেছে, রোদের তাত সামান্য যেন শুকনো করেছে গালের চামড়া।

ভ্রমর বলল, "আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।"

"রাখো. তোমাদের তাড়াতাড়ি আমার জানা আছে—"

"বলছি, দেখতে পাবে যখন ফিরব। অন্য দিন কি হয় জানো, গির্জা থেকে বেরিয়ে মা-বাবা এখানে ওখানে বসে একটু, দেখা-সাক্ষাৎ করে, গল্প করে, তাই অত দেরী হয়। চার্চে গেলে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়...।"

"তবে ত কথাই নেই।" অমল চোখ কপালে তুলে নিশ্বাস ফেলল ঠাট্টা করে।

"আজ দেরী হবে না। বাবার একটা মিটিং আছে কিসের যেন!"

অমল দু-মুহূর্ত ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন লক্ষ করল। বলল, "আমি একদিন গির্জায় গিয়ে দেখব তোমরা কি কর?"

ভ্রমর বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "গির্জা প্রার্থনার জায়গা। তোমাদের মন্দির যেমন।"

"তুমি কি কি প্রার্থনা কর?"

ভ্রমর যেন অমলের ছেলেমানুষিতে বিব্রত হল। অমলকে দেখল, অথচ ভালো করে কিছু লক্ষ করল না। কি বলবে তার মনে আসছিল না। মাটির দিকে চোখ নামাল। ঘাসের শীষ বাতাসে মৃদু-মৃদু কাঁপছিল। হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল ভ্রমর।

"এ প্রেয়ার ইজ এ প্লেজার।" অমল হুট করে বলল। এমনভাবে বলল যেন সে একটা দামী কথা শোনাবার লোভ সামলাতে পারল না।

ভ্রমর কিছু বলল না। আগের মতনই বসে থাকল। কথাটা তার কানে গিয়েছিল।

"কথাটা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস। বড়-বড় লোকরা এক-একটা যা কথা বলে—দামী কথা। আমি আর-একটা দামী কথা তোমায় শোনাতে পারি। আজ সকালে পড়েছি। বলবো? 'চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে।' বলো কোথা থেকে বললাম? একেবারে মুখস্থ বলেছি।"

ভ্রমর মুখ তুলল। কিছু বলল না।

"বারে, বা! এটা তোমার বাইবেল থেকে, স্যার। টেনে বার তিনেক পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছি।" অমল খুশী গলায় বলল, "পড়তে আমার খুব ভাল লাগল। একেবারে তোমার ডেসক্রিপসান! বুঝলে ভ্রমর, একেবারে তুমি!"

চোখের সামনে অমলের মুখ যেন খুব বড় হয়ে হয়ে কেমন দূরে চলে গেল, পরিবর্তে গির্জার মতন একটি অতি পবিত্র গৃহ দেখতে পেল ভ্রমর। কলাপাতার ছায়া, রোদের কয়েকটি ফিতে অপরাহ্ণের বেলায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে বুঝি এই বিভ্রম সৃষ্টি করল। তারপর ভ্রমর খুবই আচমকা শীত অনুভব করল। শীত তার সমস্ত শরীরের রোমকূপে কম্পন জাগাল। ভ্রমর কাঁপল।

অমল বলল, "রোদে বসে-বসেও তোমার এত শীত ধরে গেল?"

ভ্রমর নিজের অজ্ঞাতেই জবাব দিল, "শরীরটা ভাল নেই।"

"কি হয়েছে?"

"জ্বরের মতন।"

"দেখি—" অমল হাত বাড়াল, ঝুঁকে পড়ে ভ্রমরের কোল থেকে তার হাত তুলে নিল। এবং সংগে-সংগেই সবিস্ময়ে বলল, "জ্বরের মতন কি—, একেবারে সোজা জ্বর।"

ভ্রমর ভয় পেল। ভয় পেয়ে করুণ গলায় বলল, "বলো না কাউকে। লক্ষ্মীটি। ..আজ আমি গির্জায় যাব।"

"তোমার মাথা খারাপ! বেশ জ্বর এসেছে।"

"সেরে যাবে।"

"কি আছে আজকে গির্জায়?"

ভ্রমর কিছু বলল না। সব প্রার্থনায় আনন্দ থাকে না। আজকের আনন্দময় প্রার্থনা থেকে সে বঞ্চিত হতে চাইছিল না।

শীতের মধ্যে ক'দিন মেঘ মেঘ করছিল। শুকনো মেঘলা নয়, আকাশ চুঁয়ে জল পড়ার মতন ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছিল। আবহাওয়া খুব কনকনে এবং বিশ্রী হয়ে থাকত। একদিন বিকেলে বর্ষার মতন মেঘ করে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। পরের দিন সকাল থেকে মেঘ বৃষ্টি বাদলা সরে গেল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে গগন জুড়ে রোদ উঠল। এখানকার ভীষণ শীতটাও সেই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকাল থেকে যত ঝকঝকে সুন্দর আলো, গরম তুলোর মতন তপ্ত রোদ, তত বাতাস। দুপুরের গোড়া থেকে মনে হয়, রোদ যেন আর তাত ধরে রাখতে পারছে না, ক্রমশ নিবে আসছে। বাতাস আরও প্রখর দুঃসহ ও শীতল হয়ে ওঠে। বিকেল না ফুরোতেই দূরে পাতলা ধোঁয়ার মতন কুয়াশা দেখা যায়। অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ যেন অতি দ্রুত সন্ধ্যা এবং অন্ধকার এনে দিয়ে চলে যায় কোথাও।

এখানকার শীতের চেহারা দেখে অমল হয়ত মনে-মনে কিছুটা ভয় পেয়েছিল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতেই এই, শেষের দিকে কেমন হবে কে জানে! মুখে তার ভয় ছিল না; বলত : 'ফার্স্টক্লাস। একেই ঠিক শীত বলে। বুঝলে ভ্রমর, শীতেই শরীর ভাল হয়। তুমি ঠিক ঠিক ভাবে থাক, তোমার চেহারাই বদলে যাবে।"

ভ্রমরের চেহারা বদলানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বারের জ্বর সহজে যায় নি। বাড়িতে ডাক্তার এসেছিল। ভাল করে দেখে শুনে এক গাদা ওষুধপত্র ইনজেকশান দিয়ে গেছে। ভ্রমর খুব অ্যানিমিক হয়ে গেছে; অ্যানিমিক হয়ে পড়ায় ও এত দুর্বল, ওর সামান্যতেই ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে; লিমফ্‌গ্ল্যান্ড ফুলেছে। সাবধানে থাকা, ওষুধপত্র খাওয়া, বিশ্রাম এবং দুধ ফল শাক-সব্জির পথ্য পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার চলে গেছে। তার কম্পাউন্ডার বাড়ি বয়ে এসে ইনজেকশান দিয়ে যাচ্ছে ভ্রমরকে। একদিন অন্তর আসে।

মেসোমশাই বলেছেন, ভ্রমর খানিকটা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে তিনি ওকে জব্বলপুরেই নিয়ে যাবেন, বড় ডাক্তার দেখিয়ে আনবেন, সে-ব্যবস্থা হচ্ছে।

যেতে-যেতে সেই বড়দিন হবে, কিংবা জানুয়ারির গোড়া। মেসোমশাই এখন কলেজের নানা কাজে ব্যস্ত। পরীক্ষা চলছে, খাতা দেখা চলছে; তার ওপর বি. এস-সি. ক্লাসের ফোর্থ ইয়ারের ছেলেগুলোর জন্যে স্পেশ্যাল ক্লাস নিতে হচ্ছে। বাড়িতে আগের মতন সন্ধেবেলায় বসে অমলদের সঙ্গে দুটো গল্প করার সময়ও তাঁর নেই।

কৃষ্ণাও চোখের জলে নাকের জলে হচ্ছে। আজ বাদে কাল তার পরীক্ষা।

সারা বছর সে যত সাইকেল চড়ে ঘুরেছে, দোলনা দুলেছে, খেলেছে, লীলার সঙ্গে হইহুল্লোড় করেছে তার একশো ভাগের এক ভাগও বইয়ের পাতা দেখে নি। এখন মেয়ে দিন-রাত ভুলে বই মুখে করে বসে আছে। হিমানীমাসি বলেছেন, 'ক্লাস প্রমোশন না পেলে তুমি বাড়ি ঢুকো না। লীলাদের বাড়িতে আয়ার কাজ নিয়ো।' বেচারী কৃষ্ণা কোনো রকমে ক্লাসে ওঠার জন্যে বই ছেড়ে আর নড়ছে না।

হিমানীমাসি বড় অদ্ভুত মানুষ। এই যে ভ্রমরের অসুখ, তাতে তাঁর কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি কোনো রকম অযত্ন করবেন না ভ্রমরের, আবার গায়ে পড়ে যত্নও দেখাবেন না। তাঁকে ভ্রমরের জন্যে ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত হতে কেউ দেখল না। তাঁর মনের ভাবটা যেন এই রকম : অসুখ করেছে শুয়ে থাকো, ওষুধ খাও, দুধ ফল খাও, সাবধানে থাকো, সকাল বিকেল দু-পা বেড়াও।

বাদলা কেটে যখন খুব কনকনে শীত পড়ল তখন একদিন ভ্রমরের চোখ-মুখের ভাব দেখে হিমানীমাসি বললেন, "তোমার এত কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগছে যখন, তখন ওই ঘরটা বদলে নাও। পুবের ঘরটায় থাকো।"

এ-বাড়িতে আর একটা ঘর ছিল। ভ্রমরের ঘরে রোদ না-ছিল এমন নয়, একটু বেলায় রোদ আসত এবং তাড়াতাড়ি চলে যেত। ঘরটা উত্তরের বাতাস পেত। হিমানীমাসি যে-ঘরটার কথা বললেন সেই ঘরটা ছিল খুব ছোট, বাড়ির পিছন অংশে। মালপত্র রাখা হত কিছু কিছু। আড়াল-না-পড়া আলাদা ঘর বলে সারাবেলা রোদ পেত, ঘর থেকে আলো মুছত বিকেল পড়ে গেলে। উত্তরের বাতাস পেত না। ঘরটার একমাত্র অসুবিধে এই, মাথার ওপরকার সিলিংটা ছিল ময়লা, এক জায়গায় ছেঁড়া, টালি চুঁইয়ে জল পড়ত বর্ষাকালে। দরজা জানলার কাঠগুলো তেমন শক্ত ছিল না।

আয়া ঘরদোর পরিষ্কার করে দিল। পাশেই তার নিজের শোবার ঘর। টিসরি যে কত কাজের লোক, তার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সে কতখানি করতে পারে, ভ্রমরের নতুন ঘর সাজিয়ে দেওয়া দেখে সেটা বোঝা গেল। ছেঁড়া সিলিঙের গর্তটা সে কি করে যেন মেরামত করে দিল, দরজা জানলাগুলো ঠুকেঠাকে কাজে-চলা-গোছের করে দাঁড় করিয়ে ফেলল। তারপর সেই ঘরে ভ্রমরের খাট এল, বিছানা এল; একটা আলনা এনে রাখল আয়া; গোল মতন হালকা টেবিল এনে দিল ওষুধপত্র বাতি টুকিটাকি রাখার জন্যে।

অমলের প্রথমে মনে হয়েছিল, অসুখ হলে লোকে যেমন ঘরের মানুষকে সরিয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসে, ভ্রমরকেও যেন সেই রকম হিমানীমাসি আলাদা ঘরে রোগশয্যা পেতে দিল। মনে হয়েছিল, ভ্রমরকে আলাদা করে দেওয়া হল। হয়ত ভ্রমরের অসুখ হিমানীমাসিকে শঙ্কিত ও সতর্ক করেছে।

পরে কিন্তু অমলের ঘরটা খারাপ লাগল না। নতুন ঘরে ভ্রমরকে যেন খুব সুন্দর মানিয়ে গেল। এ-বাড়ির সকলের থেকে সে যেমন আলাদা, সে যেমন আড়ালে-আড়ালেই থাকতে চাইত, তার যেমন নিজের একটি শান্ত নিভৃত স্বভাব ছিল—এই নতুন একফালি আলাদা ঘর সেই রকম ভ্রমরের নিভৃত ও স্বতন্ত্র স্বভাবের সঙ্গে মিশে গেল। তা ছাড়া অমল দেখল, তার ঘরের পিছন দিকের জানলা খুলে দিলে, একফালি বাঁধানো উঠোনের ওপাশে, ভ্রমরের ঘর

দেখা যায়। অমলের খুব মজা লাগছিল। খোলা জানলা দিয়ে সে দেখত, ভ্রমর রোদভরা বিছানায় বসে কিছু সেলাই করছে হয়ত, হয়ত একটা বই মুখে করে শুয়ে আছে, কখনও বা গালে হাত রেখে বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। অমল পাথরের কুচি কিংবা কাগজের ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিত। দিয়েই লুকোত।

ভ্রমর অবশ্য টের পেত। জানলা দিয়ে এ-পাশে তাকাত, হাসিচোখে তাকিয়ে থাকত।

"এই, কি করছ?" অমল জানলায় দেখা দিয়ে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করত।

মাথা নাড়ত ভ্রমর; কিছুই করছে না।

"ঘুম মারছ?"

"না।"

"আমি আমার ফাদারকে চিঠি লিখলাম। এখন একবার পোস্টঅফিস যাব।"

"যাও!"

"চিঠিটা পোস্ট করে দিয়ে আমি আসছি।"

ভ্রমর সমস্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে মাথা নাড়ত। এস। আমি ত বসেই আছি।

আজকাল ভ্রমরের কাছাকাছি, ভ্রমরের পাশাপাশি থাকতেই অমলের ভাল লাগে। বাইরে ঘুরে বেড়াবার সঙ্গী ছিল ভ্রমর, কৃষ্ণাও থাকত কখনও-কখনও। ওরা ঘর ছেড়ে বেরোতে পারে না বলে অমলও বড় একটা বাইরে যায় না। এক-দিন টাওয়ার দেখতে গিয়েছিল একাই, কোনো সুখ পায় নি। আর একদিন গিয়েছিল বেশ একটু দূরে ঝরনা দেখতে, মেসোমশাই বলে-বলে পাঠিয়ে-ছিলেন, ভাল লাগে নি অমলের। ঝরনা বলেই মনে হয় নি তার। পাথর চুঁইয়ে জল পড়লেই ঝরনা হয় নাকি!—দূর...।

ভ্রমর জিজ্ঞেস করেছিল, "রামধনু দেখ নি?"

"কিসের রামধনু! ওই ঝরনার আবার রামধনু!" অমল নাক কুঁচকে বলেছিল।

ভ্রমর একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঝরনাটা এত খারাপ কিছু নয়। বলেছিল, "তুমি ভাল করে কিছু দেখ নি।"

"দেখি নি; দেখতে ইচ্ছেও করল না।"

"তবে! মিছিমিছি নিন্দে করছ কেন?"

"নিন্দে আবার কি! ভাল লাগে নি, লাগে নি।—তুমি যদি আমাদের দিকে যাও ঝরনা দেখিয়ে দেব। জল পড়ার শব্দ শুনলে মাথা ঘুরে যাবে তোমার।" বলেই অমল কি ভাবল একটু, তারপর ভ্রমরের চোখে-চোখে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, "তুমি না থাকলে আমার বেড়াতে-টেড়াতে ভালই লাগে না। একা-একা!...হ্যাত্, অসুখ করে যা-কান্ড করলে একটা—সব মাটি হয়ে গেল।"

সত্যিই অমলের সব মাটি হয়ে গিয়েছিল। বাইরে আর তার বেরুতে ইচ্ছে করত না, ভাল লাগত না। ভ্রমরের অসুখ তাকে খুব হতাশ করেছিল, মন ভেঙে দিয়েছিল। সে এই অসুখের কথা চিন্তা করত। ভ্রমরের ওপর তার রাগ হত, দুঃখ হত। ইচ্ছে করে, নিজের অসুখ লুকিয়ে রেখে-রেখে ভ্রমর আজ এই রোগটা বাঁধিয়েছে। সব জিনিস কি আর চেপে রাখা যায়! মানুষের

শরীর অন্য জিনিস। ভ্রমর যে কেন হোমসাইন্স পড়েছিল ভগবানই জানেন। সেই বেয়াড়া কথাটা অমলের মনে পড়ত। ইনকিউবেশান পিরিআড; ভ্রমরকে অমল শুনিয়ে দিয়েছে কথাটা—"বুঝলেন হোমসাইন্স-এর স্টুডেন্ট মশাই, একেই বলে ইনকিউবেশান পিরিআড। ভেতরে ভেতরে আপনি রোগটিতে তা দিচ্ছিলেন।"—এ-রকম বোকা কেন হয় মানুষ? বোকামির ফল এবার ভোগ কর।

ভ্রমরকে আজকাল দেখলেও বড় মায়া হয়। সমস্ত মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যেন গালে মুখে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই। ভীষণ শুকনো দেখায়, খড়ি ওঠা-ওঠা। লাবণ্য নিবে যাচ্ছে। শীর্ণ প্রাণহীন চেহারা হয়ে এসেছে, হাত দুটি রোগা, আঙুলগুলো নিরক্ত। ভ্রমর যে কত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে গেছে অমল বেশ বুঝতে পারে। শুধু চোখ দুটি এখনও টলটল করছে। যেন ভ্রমর বাইবেলের সেই সরল দুটি চোখ নিয়েই বেঁচে থাকবে।

এ-সব সত্ত্বেও অমল আশা করছিল, এতটা দুর্বল ভ্রমর থাকবে না। ডাক্তারে ওষুধে পথ্যে তার চিকিৎসা চলছে, সে ভাল হয়ে উঠবে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

ভ্রমরের শরীর তখন একটু ভালর দিকেই ফিরছিল।

সেদিন খুব শীত পড়েছিল। দুপুর থেকেই মনে হচ্ছিল, বাতাস যেন বরফকুচির মতন ঠান্ডা, রোদ একেবারে ফিকে লাগছিল, গায়ের হাড়মাংসে কনকনে ভাবটা এমন করে জড়িয়ে ধরেছিল যে সব সময় কুঁকড়ে থাকতে হচ্ছিল। উত্তরের কোনো হিমেল হাওয়া এসে পড়েছিল বোধ হয়।

এই রকম ঠান্ডার দিনে হিমানীমাসি এবং মেসোমশাই বাড়ি ছিলেন না। বিকেলের পর একটা মোটর গাড়ি এসেছিল। শীতের সব রকম সাজগোজ করে তাঁরা বেরিয়ে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

মেসোমশাইরা কোথায় গেছেন অমল শুনেছে। এখান থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। আজ এদিককার মিশনারীদের মস্ত এক দীনজনের মেলা আছে। সামনে বড়দিন। বড়দিনের আগে আগে প্রতি বছর একটা মেলা বসায় মিশনারী সোসাইটির লোক। অনেকটা এক্সিবিশানের মতনই। কিছু দোকানপত্র থাকে অবশ্য, কিন্তু এই মেলার সব কিছুই "চ্যারিটি ফর পুয়োর"-এর জন্যে। আতুর সেবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ, পোশাক-আশাক সংগ্রহ, খাদ্য সংগ্রহ। লটারি খেলা হয়, কনসার্ট বাজানো হয়, বেবী-শো হয়।

হিমানীমাসি যাবার সময় দুটো উলের জামা, পুরনো চাদর একটা, কয়েকটা শাড়ি আরও যেন সব কি-কি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গেছেন। মেসোমশাই যাবার সময় হঠাৎ বলেছিলেন, 'অমল, তোমার নামে এবার লটারি খেলব। যদি জিতে যাই, টাকাটা তবে তোমার নামেই ডোনেট করে দেব।' বলে মেসোমশাই হেসেছিলেন।

অমল তখন বুঝতে পারে নি, পরে ভ্রমর তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। 'লটারির টাকা কেউ নেয় না। চ্যারিটিতেই দিয়ে দেয়।'

হিমানীমাসিরা চলে যাবার পর অমল কৃষ্ণাকে বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে

খানিক ব্যাডমিণ্টন খেলল। শীতের জড়তা দূর করবার জন্যেই বোধ হয়। কিন্তু বাতাসের দাপটে খেলতে পারল না, বাইরেও থাকতে পারল না। চোখে মুখে গায়ে যেন কনকনে বাতাসটা কামড় দিচ্ছিল। হিহি করে কাঁপুনি উঠ-ছিল সর্বাঙ্গে। বিকেলের মরা আলোটুকু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। কুয়াশা ঘন হয়ে চারপাশ ঢেকে ফেলল, ভার ধোঁয়ার মতন থিকথিক করছিল সর্বত্র।

কৃষ্ণার পরক্ষা চলছে। কাল তার হিন্দী ভার্নাকুলার। মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বসতে গেল।

অমল যখন ঘরে এল তখন আয়া বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরে-ঘরে। জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে। ভ্রমরের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অমল ভাবল, ভ্রমর তার ঘরে বসে আছে।

শীতের জন্যে অমল আরও একটু বেশী রকম জামা চাপাল। সে যখন কোট গায়ে দিয়ে গলায় মাফলার বেঁধে শিস দিচ্ছিল, তখন তার কানে গেল ভ্রমর কি যেন বলছে আয়াকে করিডোর দিয়ে যেতে-যেতে। মনে হল, ভ্রমর ও-পাশে কোথাও যাচ্ছে। পা দুটো ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল বলে অমল বিছানায় বসে মোজা পরে নিল।

আজ এখন খুব গরম চা খেতে হবে। হিমানীমাসি যখন নেই তখন, অমল মনে-মনে খুব খুশী হয়ে ভাবল, আয়াকে বললেই এখন চা করে দেবে।

মোজা পরে জুতোয় পা গলিয়ে অমল যখন বাইরে আসছে তখন তার কানে অর্গানের শব্দ এল। করিডোর প্রায় অন্ধকার, কৃষ্ণার ঘরে বাতি জ্বলছে, খাবার ঘর থেকে পাতলা একটু আলো এসে পড়েছে। অর্গানের শব্দ শুনেই অমল বুঝতে পারল ভ্রমর অর্গানে গিয়ে বসেছে। অনেক দিন পরে আজ আবার ভ্রমর অর্গানে হাত দিল।

অমল খুশী হল। করিডোর দিয়ে যাবার সময় সে একবার কৃষ্ণার ঘরে উঁকি দিল। কৃষ্ণা খুব আয়াস করে পড়তে বসেছে। বিছানায় আসন করে বসে গায়ে র‍্যাপার জড়িয়েছে, পা চাপা দিয়েছে লেপে।

"আরে বাব্বা, এত চাপাচুপি দিয়ে পড়তে বসেছ! ঘুমিয়ে পড়বে যে!" অমল হেসে বলল।

"না, ঘুমোবো না! কী রকম জাড়া!"

"চা খাবে?"

"আপনি বানাবেন?"

"অ্যারেঞ্জমেণ্ট করছি।" অমল আশ্বাস দিয়ে হাসল। "আয়াকে বলি—"

কৃষ্ণা স্প্রিঙের ওপর দুবার যেন বসে বসেই লাফিয়ে নিল। বলল, "আয়া আমায় দেবে না।"

"দেবে। জরুর দেবে।" অমল হেসে বলল। "তুমি পড়ো। চা পাবে। ওআর্ড ইজ ওআর্ড।"

অমল হাসিমুখে বেরিয়ে এল। করিডোর দিয়ে যেতে-যেতে শুনল আস্তে করে অর্গান বাজছে। খাবার ঘরের দরজার কাছে আয়ার সঙ্গে দেখা হল। অমল চা তৈরী করে দেবার কথা কথা বলল। সে কৃষ্ণা এবং ভ্রমরের জন্যেও চা করতে বলল।

বসার ঘরে দরজা জানলা বন্ধ। পরদা টানা। বাতি জ্বলছে। ভ্রমর অর্গানের সামনে বসে অন্যমনস্কভাবে একটা সুর বাজাচ্ছিল। অমল দেখল, ভ্রমর পোশাক-আশাকের কোনো তাচ্ছিল্য করে নি। গরম পুরো-হাতা জামা গায়ে দিয়েছে। গলার কাছে ফ্লানেলের সাদা মাফলার জড়ানো। অর্গানের রিডের ওপর তার দু-হাতের আঙুল নরম করে বুলোচ্ছিল; মুখ তুলে অমলকে দেখল।

কাছে এসে বসল অমল। ভ্রমর গাইছিল না, শুধু অন্যমনস্কভাবে সুরটা বাজিয়ে যাচ্ছিল। আজ ভ্রমরকে সামান্য ভাল দেখাচ্ছিল। তার মাথার চুলগুলি পরিষ্কার, একটু চকচক করছে, কপালের সিঁথিটি স্পষ্ট, পিঠের ওপর বিনুনি ছড়ানো রয়েছে। চোখ মুখে একটু সতেজ ভাব ফুটেছে যেন!

"আরে ব্বাস, আজ একেবারে অর্গান বাজাতে বসে গেছ!" অমল খুব খুশী হয়েছিল বলে ঠাট্টা করে বলল। তার মুখে তৃপ্ত হাসি।

ভ্রমর ঠোঁট খুলে আরও একটু হাসি ছড়াল।

অমল বলল, "গায়ে তাহলে তোমার বেশ শক্তিটক্তি হচ্ছে।"

"আমি শুধু বিছানায় শুয়ে থাকি নাকি?" ভ্রমর জবাব দিল।

"না সব সময় শুয়ে থাকো না; তবে দেদার ফাঁকি মারছিলে।"

"ফাঁকি! ইস্—!" ভ্রমর চোখের ভুরু বাঁকা করে বলল, "কী মিথ্যুক!"

অমল হাসল। ভ্রমর সত্যিই সব সময় শুয়ে থাকত না; আগের মতন সংসারের নানা রকম ছোট-ছোট কাজ সে করতে পারত না আজকাল, তবু টুকটাক কিছু করত। এখনও ভোর বেলায় অমলকে সে ডেকে দেয় রোজ; মেসোমশাইয়ের ভোরের চায়ের সঙ্গে অমলকে চা করে দেয়।

"তোমাকে আজ খানিকটা ফ্রেশ দেখাচ্ছে—" ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে ভ্রমরকে দেখতে-দেখতে অমল বলল।

"আজ আমার ভাল লাগছে।" ভ্রমর সামনের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কথা বলার মতন করে বলল। সে আনমনা অর্গান বাজিয়ে যাচ্ছিল, ধীরে-ধীরে।

"শরীর ভাল থাকলেই মন ভাল থাকবে।" অমল বিজ্ঞের মতন গলা করে জবাব দিল। এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, "তোমার শরীরও আজ ভাল দেখাচ্ছে। রক্তটক্ত হচ্ছে মুখে।"

ভ্রমর কিছু বলল না। আঙুল অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল বোধ হয়, অর্গানের দিকে তাকিয়ে সুরটা ঠিক করে নিল।

সামান্য সময় নীরব থেকে অমল কি ভেবে হঠাৎ গলা গম্ভীর ও ভারী করে বলল, "ভ্রমর, অনেকদিন তুমি কোনো উপাসনা গাও নি। তোমার কোনো কাজে মন নেই।" বলে অমল মুখ গম্ভীর করে থাকল।

ভ্রমর হেসে ফেলল। অমল মা'র মতন, মা'র বলার ধরন নকল করে কথাগুলো বলল। কী রকম দুষ্টু!

"তোমার খুব সাহস বেড়েছে।" ভ্রমর নকল গলায় ভৎর্সনা করল। "দাঁড়াও, আমি মাকে বলে দেব।"

"দিও। আমি বলব, আমি ওকে উপাসনা গাইতে বলেছিলাম।"

"মা বিশ্বাস করবে না।"

"কেন? হিমানীরানী বিশ্বাস, ভ্রমরলতা বিশ্বাস না হলে আর বিশ্বাস

করা যায় না!" অমল মজার মুখ করে বলল।

"আমার নাম ভ্রমরলতা নয় মোটেই।" ভ্রমর হাসল।

অমল যেন কানই করল না, বলল, "ভ্রমররা লতাটতা ফুলটুলের কাছেই খালি ওড়ে। কি রকম একটা রাগের শব্দ করে, শুনেছ?"

ভ্রমর অর্গান বাজানো থামিয়ে দিয়েছিল। থামিয়ে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অপলকে। বলল, "তুমি ভ্রমর দেখো নি। কেমন দেখতে হয় বল ত?"

"দেখি নি! কি বলছ!..." অমল রঙগর চোখ মুখ করে বলতে লাগল, "দেখেছি। সামনেই দেখতে পাচ্ছি।" বলতে-বলতে অমল হোহো করে হেসে উঠল।

ভ্রমর কেমন বোকা হয়ে গেল। হেসে ফেলল। এবং অকস্মাৎ সে কেমন লজ্জা অনুভব করল।

খানিক পরে অমলই বলল, "একটা গান গাও না!"

"না।"

"কেন?...আস্তে আস্তে গাও। ভ্রমরের মতন করেই গাও।"

ভ্রমরের চোখের দুই পাতা জুড়ে লজ্জা মাখানো ছিল তখনও। বলল, "তুমি দিন দিন খুব ইয়ার্কি শিখছ!"

"একটা কিছু যদি এখান থেকে শিখে না যাই তবে লোকে বলবে কি! দেশভ্রমণ থেকে শিক্ষা পাওয়া দরকার, বুঝলে না। স্কুলে পড়েছি।" অমল আবার হাসল।

ভ্রমর বুঝতে পারছিল অমলকে আজ আর কথায় পারা যাবে না। খুব বাক্য-বাগীশ হয়েছে ছেলে। এত আনন্দের আজ কি পেল অমল, ভ্রমর বুঝতে পারল না।

টিসরি চা নিয়ে এল। ট্রেতে করে চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে এনেছে, তৈরী চা। অমল বলল, "আমি চা তৈরী করতে বলেছিলাম। যা শীত, বরফ হয়ে যাচ্ছি। তুমি এক পেয়ালা খাও, ভ্রমর; বেশ গরম লাগবে শরীর।"

আয়া চায়ের পেয়ালা তুলে দিল অমলের হাতে, ভ্রমরকে দিল। কৃষ্ণাকেও দিয়ে এসেছে। চা দিয়ে চলে যাবার সময় ভ্রমরকে বলল, ভ্রমরের ঘরে আগুন রেখে এসেছে।

অমল চা খেতে-খেতে বলল, "আমায় একটা জিনিস খাওয়াবে?"

ভ্রমর বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। অমলের মুখে যেন কিসের ফন্দি।

"মেসোমশাইয়ের ঘর থেকে দুটো সিগ্রেট চুরি করে নিয়ে এস না। এই শীতে একটু স্মোক করি।"

ভ্রমরের চোখের পাতার পলক পড়ল না। বড়-বড় চোখে সে তাকিয়ে থাকল। অমলের সত্যিই খুব সাহস বেড়ে গেছে। কয়েক পলক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর ভ্রমর জিবের কেমন একটা শব্দ করল, যার অর্থ, খুব পাকামি হচ্ছে, না?

"চোখ গোল্লা করে দেখছ কি?" অমল বলল, "বিকেল থেকেই খুব সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছে। বাজারে যেতে পারলে আমি একটা গোটা প্যাকেট কিনে

আনতাম।”

“তুমি খুব চালাকি শিখেছ আজকাল।” ভ্রমর বলল।

“চালাকি কিসের। সিগ্রেট খাওয়া কি মদ খাওয়া?”

“তোমার জন্যে আমায় বাবার ঘর থেকে সিগ্রেট চুরি করতে হবে! খুব মজা পেয়েছ—”

“চুরি না ভাবলেই চুরি নয়। সিগ্রেট চুরিতে পাপ হয় না। আমি দেখেছি, বউদি কতবার বাবার পকেট থেকে সিগ্রেট চুরি করে দাদাকে দিয়েছে।”

“আমি এনে দেব না। তুমি নিয়ে এস।” ভ্রমর বলল। বলে একটুও হাসল না। চায়ের পেয়ালায় মুখ নামিয়ে হাসি চেপে থাকল।

অমল লক্ষ করে দেখল ভ্রমরকে, বলল, “তুমি একেবারে—একেবারে—কি বলে যেন—পিউরিটান।”

“পিউরিটান—”

“গোঁড়া। গোঁড়া বোষ্টম একেবারে।”

ভ্রমর পাতলা দুটি ঠোঁট ভেঙে হেসে ফেলল, তার সাদা সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল স্পষ্ট। ডালিমের দানার মতন দেখাল। বলল, “চুরি করতে না পারলে বুঝি গোঁড়া হয়?”

অমল ঠিক জবাব খুঁজে পেল না। জবাবের জন্যে তার চিন্তাও ছিল না। ভ্রমরের সুন্দর হাসিটি সে চোখ ভরে দেখছিল।

বসার ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবু সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ থাকায় সেই আলো ঘরের মধ্যে যেন একটু ভাল করেই ছড়িয়ে পড়েছিল। অমল ভ্রমরকে ভাল করে দেখল; মনে হল, ভ্রমরকে এত অসুখের মধ্যেও আজ বড় মধুর দেখাচ্ছে। তার ছোট্ট কপালে চুলের একটু আঁশও নেই, তার সরু দুর্বল গালে খুব পাতলা এক-রকম খুশী ফুটে আছে, টলটলে দুটি চোখে চাপা হাসি। দেখতে দেখতে অমল বলল, “ভ্রমর, তুমি যখন আরও বড় হবে, তোমার শরীর সেরে যাবে, তখন তুমি খুব বিউটিফুল হবে।”

কথাটা অমল আবেগবশে বলেছিল। সে আরও বলতে যাচ্ছিল কিছু। কথা খুঁজে না পেয়ে বলতে পারল না। মুগ্ধ আবেশ-চোখে তাকিয়ে থাকল।

ভ্রমর প্রথমটায় যেন বুঝতে পারে নি, বা খেয়াল করে নি। পরমুহূর্তে সে খেয়াল করতে পারল, অনুভব করতে পারল। দু-পলক অচেতনের মতন তাকিয়ে থাকল অমলের চোখের দিকে, তারপর পলক ফেলে মুখ নত করল।

দুজনেই চুপ করে থাকল। এবং দুজনেই বেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হয়ে পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে অন্য কিছু লক্ষ করছিল। কিছু সময় কেটে গেল। শেষে ভ্রমর বলল, “ও-ঘরে চলো; এখানে খুব ঠান্ডা লাগছে।”

ভ্রমরের ঘরে পা দিয়ে অমল বেশ আরাম পেল। আয়া বড় মাটির মালশায় কাঠকয়লার আগুন রেখে দিয়ে গেছে এক পাশে। ঘরের বাতাস কনকন করছিল না। খুব শীত পড়ার পর থেকে আয়া এইভাবে আগুন দিয়ে যায় রাত্তির-বেলায়, বসার ঘরে দেয়, হিমানীমাসিদের ঘরে দেয়, ভ্রমরের ঘরে দেয়। আজ বসার ঘর ফাঁকা বলে দেয় নি।

অমল এগিয়ে গিয়ে ভ্রমরের বিছানায় বসল। ভ্রমর আসছে। সে অমলকে আসতে বলে কোথায় গেল যেন। বিছানায় বসে অমল মাথার ওপরকার সিলিং দেখল। ছায়া মাখানো, অন্ধকার। ঘরের দুটি জানলাই একেবারে বন্ধ। বিছানাটা নরম। কেমন এক গন্ধ উঠছে—গন্ধটা ভ্রমরের গায়ের—অমল এই গন্ধ ঘ্রাণে চেনে। ক্যান্থারাইডিন তেল, ওটিন পাউডার আর যেন কি-কি মেশানো গন্ধ। কিন্তু ভ্রমরের শরীরের গন্ধে এর বেশীও কি যেন থাকে। দুর্বলতার গন্ধ কি? হয়ত। ভ্রমরের কোমল ও ভীরু, অসুস্থ ও শীর্ণতার কোনো গন্ধ আছে, নাকি ভ্রমরের নম্রতা ও মায়া-মমতার কোনো গন্ধ, অমল ঠিক বুঝতে পারল না।

অমল উন্মনা এবং উদাস হয়ে বিছানায় পিঠ দিয়ে লেপের ওপর শুয়ে পড়ল; তার পা মাটিতে, কোমর থেকে মাথাটা বিছানায়। শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গাইল : 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।'

প্রথমে মৃদু গলায়, তারপর একটু গলা তুলে গানের প্রথম দু-কলি গাইতেই ভ্রমর ঘরে এল। ভ্রমর এসেছে অমল বুঝতে পারল। বুঝতে পেরেও উঠল না। আরও একবার দু-কলি গেয়ে শেষে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসল।

ভ্রমর দাঁড়িয়েছিল সামনে, দরজা থেকে মাত্র দু-পা এগিয়ে এসে। অবাক, নিঃশব্দ।

অমল খুব যেন একটা বিস্ময়কর কিছু করে ফেলেছে, এমন মুখ করে বলল, "কি রকম বিউটিফুল গান দেখলে ত! গাইতে না গাইতেই তুমি এসে গেলে!" বলে অমল গলার মাফলারটা খুলে বিছানায় রাখল। "গানটা খুব সুন্দর। আমি জানি না। মাত্র দুটো লাইন জানি। বউদি গায়।"

ভ্রমর একটু সরে এল। বিস্ময় ভাব সামান্য যেন কেটেছে। আড়ষ্টতা ছিল, তবু ভ্রমর বলল, "সবটা শিখলেই পারতে!"

অমল দু-মুহূর্ত ভাবল। ভেবেই বলল, "আমি কি জানতাম এখানে একটা ভ্রমর আছে!" বলে অমল দুষ্টুমির মুখে হাসল।

ভ্রমর কেমন বিরক্ত বোধ করল। মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্যি, অমল জানত না এখানে ভ্রমর আছে।

সামান্যক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভ্রমর হাতের মুঠো থেকে সিগারেট বের করে বাড়িয়ে দিল। "এই নাও।...তোমার জন্যে চুরি করতে হল।" বলে কত যেন দুষ্কর্ম করেছে এ-রকম একটা ভাব করে ঠোঁট গাল গম্ভীর করল ভ্রমর।

অমল হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে। বলল, "পরের জন্যে চুরি করলে তাকে চোর বলে না।" হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল অমল। ভ্রমর একটা মাত্র সিগারেট এনেছে। ভীষণ কৃপণ। অমল কাঠকয়লার পাত্রর কাছে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "তুমি খুব কঞ্জুস; মাইজার। মাত্র একটা সিগারেট আনলে।"

"একটাই খাও। নেশাখোর হতে হবে না।" ভ্রমর বড়জনের মতন গলা করে বলল।

"একটা আমি দু-মিনিটে উড়িয়ে দেব।" অমল সিগারেট ধরিয়ে নিল।

কি ভেবে ভ্রমর বলল, "বাড়ির মধ্যে সিগারেট খাচ্ছ। যদি কেউ দেখতে পায়?"

"পাবে না। কৃষ্ণা জানে। আমি একদিন তার সামনে খেয়েছি। সে এখন পড়ছে—আসবেও না।" অমল ধোঁয়া উড়িয়ে বলল। "আয়াও এখন আসছে না।"

"আহা, আমার ঘরে যে গন্ধ থাকবে!"

"উড়ে যাবে। খানিকটা পরেই উড়ে যাবে।"

বলে অমল দরজার কাছে গেল, মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখল, তারপর খুব মেজাজ করে পা ফেলে ভ্রমরের বিছানার দিকে এল। "তোমার ঘরে তোমার বেশ একটা গন্ধ আছে।"

ভ্রমর বিছানায় বসেছে ততক্ষণে। অমলের কথায় চোখ তুলে তাকে দেখল।

অমল বলল, "তোমার বিছানায় শুয়ে ছিলাম— হঠাৎ আমি গন্ধটা পেলাম। ভেরী বিউটিফুল।"

ভ্রমর সর্বাঙ্গে শিহরন অনুভব করল। তার মন যেন উষ্ণতাবশে কেমন স্বাভাবিক থাকল না। অমলের মুখের গন্ধ সে পুনরায় স্মরণ করতে পারল। তার আবার সেই গন্ধ পেতে বাসনা জাগল।

অমল এগিয়ে এসে বিছানার কাছে দাঁড়াল। বলল, "আমি দেখেছি, মেয়েদের গায়ে কি রকম একটা গন্ধ থাকে। মা'র শাড়ির গন্ধ থেকে আমি বলে দিতে পারি এটা মা পরেছিল।...তুমি বিশ্বাসই করবে না! দিদির চিরুনি এনে দাও আমি ঠিক বলে দেব ওটা মেজদির মাথার—" বলতে বলতে অমল থামল। হয়ত তার বাড়ির মা এবং দিদির কথা মনে পড়ে গেল। সামান্য অন্যমনস্ক হল। তারপর নিশ্বাস ফেলে আবার বলল, "আমার গন্ধের নাক খুব শার্প। তোমার গন্ধটাও আমার চেনা হয়ে গেছে। একদিন টেস্ট করে দেখো—ঠিক বলে দেবো।"

ভ্রমর কিছু শুনছিল না। সে শুনতে পাচ্ছিল না। তার সমস্ত চেতনা কোনো আশ্চর্য জগতে যেন ভেসে গিয়েছিল। সেখানে কোনো অদ্ভুত শক্তি তাকে চুম্বকের মতন ক্রমাগত আকর্ষণ করছিল। ভ্রমর ঘুমের মধ্যে সময় হারানোর মতন তার অনেকগুলি প্রখর চেতনা হারিয়ে এই স্রোতে ভেসে গেল। তার রোমাঞ্চ হয়েছিল, তার ভীরুতা হৃদয়কে কম্পিত করছিল।

অমল বিছানায় এসে বসল। বলল, "ছেলেদের কোনো রকম গন্ধ নেই গায়। আমরা সবাই এক রকম।"

"তোমার আছে।" ভ্রমর বিছানার ওপর চোখ স্থির রেখে যেন স্বপ্ন দেখতে-দেখতে অস্ফুট গলায় বলল আচ্ছন্নের মতন।

অমল ভ্রমরের চোখ লক্ষ করে বিছানার দিকে তাকাল, বিছানার ওপর একটু ভাঁজ, ভাঁজটা অমলের কেমন রহস্যময় লাগল। চোখ তুলে ভ্রমরকে দেখল। ভ্রমরের সমস্ত মুখ কি রকম টকটক করছে, যেন রক্ত ছুটে এসেছে; ভ্রমরের চোখের পাতা প্রায় বোজা, নাকের ডগাটি ফুলে উঠেছে। অমল এ-রকম মুখ ভ্রমরের দেখে নি। তার চোখে ভ্রমর এই মুহূর্তে কেমন জ্ঞান ও বোধের অতীত এক অন্যরকম ভ্রমর হয়ে উঠল।

অমল কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ হাত বাড়াল। ভ্রমরের কোলের ওপর থেকে হাত তুলে নিল। তার মনে হল, ভ্রমরের হাত কাঁপছে, মনে হল, তার নিজের হাত খুব গরম। সিগারেটটা ফেলে দিল অমল মাটিতে।

"এই—" অমল আস্তে করে ডাকল।

ভ্রমর মুখ তুলছিল না। অমল আবার ডাকল। ভ্রমর আনত মুখেই থাকল। অমল নীচু মুখ করে ভ্রমরকে দেখতে গিয়ে দেখল ভ্রমরের চোখে জল, ভ্রমর কাঁদছে। ভ্রমর কেন কাঁদছে, অমল খানিকটা যেন বুঝল খানিকটা বুঝল না। তার খারাপ লাগল। মনে বড় কষ্ট পেল। তার বুকের মধ্যেও কি-রকম করছিল।

"এই—, একি!" অমল হাত বাড়িয়ে ভ্রমরের থুতনি তুলে মুখ উঁচু করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভ্রমর কিছুতেই মুখ ওঠাবে না।

অমল ভ্রমরের আরও সামনে ঝুঁকে পড়ে ভ্রমরের মুখ তুলে ধরল। ভ্রমরের গাল ভিজে গেছে, ঠোঁট শক্ত করে ভ্রমর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

অমল আদর করে, মায়াবশে, ভালবেসে ভ্রমরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল। তখন ভ্রমর অমলের বুকে মুখ লুকোলো। না, লুকোনো নয়, অমলের বুকের কাছে তার মাথা এবং মুখ সমর্পণ করে দিল।

ভ্রমরের চুল, ভ্রমরের মুখ, ভ্রমরের সর্বস্ব থেকে যে-গন্ধ উঠল—অমল সেই গন্ধে আচ্ছন্ন ও নিমগ্ন হয়ে ভ্রমরের মুখের পাশে নিজের গাল রাখল। ওরা পরস্পর উভয়ের হৃদয় অনুভব করে আজ দুটি গাল জোড়া করে, দুটি মুখ একত্র করে এবং ওষ্ঠ স্পর্শ করে কোনো গভীর অবিচ্ছিন্ন রহস্যময় আনন্দ অনুভব করছিল।

৭

রাত্রে অমলের ঘুম ছিল না। সর্বক্ষণ সে ভ্রমরকে ভাবছিল। এই ভাবনা অন্য দিনের মতন নয়; অন্যান্য দিন সে যখন ভ্রমরের কথা ভাবত তখন সহানুভূতি করুণা মমতা ও প্রীতির মন নিয়ে ভাবত। হয়ত ভালবাসার মন নিয়েও। কিন্তু সে-ভালবাসা আজকের মতন নয়। আজ অমল তার ভালবাসাকে এত স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারছিল যে, তার মনে হচ্ছিল সে যেন দেখতে পাচ্ছে সব।

ভালবাসাকে দেখতে পাওয়ার জন্যেই এই অনুভূতিটা তার কাছে আবিষ্কার বলে মনে হচ্ছিল। সহসা কি যেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গিয়ে সে এই নতুন দুর্লভ মূল্যবান জিনিসটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। অমল প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হচ্ছিল। খুব বড় নদী, যার এ-পার ও-পার দেখা যায় না, সেই রকম নদী যদি কোনো নতুন সাঁতারু পার হয়ে আসে তবে তার মনে যে হর্ষ ও বিশ্বাস জাগে, দুঃসাধ্য সাধনের তৃপ্তিতে সে সর্বক্ষণ রোমাঞ্চিত হতে থাকে, অমলের মনে সেই রকম হর্ষ ও রোমাঞ্চ হচ্ছিল। নিজের এই নতুন চেতনা অমলকে প্রসারিত ও পূর্ণ করছিল। সে ভাবছিল, তার হাতে হঠাৎ এমন একটা কিছু এসে গেছে যা অত্যন্ত সুন্দর, যার অসম্ভব শক্তি, যা মানুষকে সবচেয়ে বেশী সুখ দেয়।

এই সুখ অমলকে আচ্ছন্ন করে রাখছিল। এ-রকম আশ্চর্য সুখ এবং আনন্দ অমল আগে আর কখনও অনুভব করে নি। তার মন কখনো কোনো কারণেই এত অধীর ও উতলা হয় নি। অমল হৃদয়ে অজস্র সুখ উপচে-ওঠা, সুখগুলির নরম ও অদ্ভুত ফেনা মাখামাখি হয়ে যাবার তৃপ্তি ও শিহরন অনুভব করছিল। সে বুঝতে পারছিল, তার বুক মাঝে মাঝেই থরথর করে কেঁপে উঠছে, তার হাত মুখ ঘাড় বেশ গরম, তার কপাল এবং কান জ্বালা করছে, তার চোখ ভ্রমর ছাড়া জগতের আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

বাইরের প্রচণ্ড শীত অন্যদিন অমলকে সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট করত। আজ সে এত উত্তেজিত এবং অস্থির হয়েছিল যে, অমল শীত অনুভব করতে পারছিল না। সে ঘুমের জন্য কাতর হচ্ছিল না। বরং পায়ের পাতা গরম লাগায় পা থেকে লেপ সরিয়ে দিয়েছিল। সে ঘুম চাইছিল না। মানুষ নিজেকে কোনো-কোনো সময় স্বাভাবিক নিয়ম এবং স্বভাব ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তুলে আনতে চায়। অমল সেই রকম চাইছিল; সে তার বয়স এবং অপরিণত মনকে বাস্তব কয়েকটি বাধা থেকে মুক্ত করে প্রসারিত করতে চাইছিল। সে ভাবছিল, তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে, সে পূর্ণবয়স্ক হয়েছে, সে নারীর প্রেম ও স্পর্শ পেয়েছে, সে আজ যথার্থ পরিণত। সাবালক এবং পরিণত ব্যক্তির মতন সে

কোনো কোনো দুরূহ চিন্তাও করতে চাইছিল।

আজকের ঘটনাটি কি করে ঘটল অমল ভাববার চেষ্টা করেছিল। সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল হঠাৎ কেমন করে সব ঘটে গেছে। সে কিছু বুঝতে পারে নি, ভ্রমর কিছু বুঝতে পারে নি—তবু ও-রকম হয়ে গেল। ভ্রমরকে তখন অন্যরকম দেখাচ্ছিল, ভ্রমরের জন্যে তখন অমলের বুকের মধ্যে কি রকম যে করছিল বোঝানো যায় না। বোধ হয় তখন অমল ভ্রমরকে এত বেশী নিজের করে ভাবতে চাইছিল, তার জন্যে এত কিছু করতে চাইছিল, বলতে চাইছিল, ওকে সবই দিতে ইচ্ছে করছিল যে, ভ্রমরকে তার তীব্র ইচ্ছাটুকু না জানিয়ে পারে নি। এই আকাঙ্ক্ষাই কখন গড়ন পেয়ে ভালবাসা হয়েছিল। ভ্রমরও অমলের কাছে এই ভালবাসা চাইছিল।

পরে অমলের লজ্জা এবং ভয় হয়েছিল। সে ভেবেছিল, কেউ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কেউ দেখে নি। অমল ভেবেছিল, ভ্রমর রাগ করবে, ভ্রমর তাকে খারাপ ভাববে। ভ্রমর রাগ করে নি, তাকে খারাপ ভাবে নি। ভ্রমর রাগ করলে কিংবা খারাপ কিছু ভাবলে ও-রকম মুখ করত না। তার মুখ তখন টলটল করছিল, আভা দিচ্ছিল রোদ-মাখা ফুলের মতন অনেকটা; সেখানে রাগ বিরক্তি ছিল না। ভ্রমর তারপর আর একটিবার মাত্র চোখ তুলেছিল। কোনো কথা বলে নি। অমল চলে এসেছিল। যদি ভ্রমর রাগ করত কিংবা তাকে খারাপ ভাবত তাহলে ফুলের মতন মুখ করে তাকে দেখত না। তার চোখের পাতা জড়ানো থাকত না।

খাবার সময় ভ্রমর কৃষ্ণা ও অমল তিনজনে বসে একসঙ্গে খেয়েছে। হিমানী-মাসিরা তখনও ফেরেন নি। খেতে বসে অমল এবং ভ্রমর দুজনেই কেমন লজ্জায়-লজ্জায় ছিল, চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না পরস্পরের দিকে। অথচ ইচ্ছে করছিল খুব। অমল চোরের মতন যখনই চোখ তুলেছে, দেখেছে ভ্রমর মুখ নীচু করে আছে, খাচ্ছে না বড়। তার মুখ নীচু হওয়া সত্ত্বেও সে অমলকে দেখে নিচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে অমল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছিল। ভ্রমর বলল, "দুধ খেয়ে ওঠো", বলে উঠে গিয়ে আয়াকে দুধ দিতে বলল। অমল যখন দুধ খাচ্ছিল তখন কৃষ্ণা উঠে পড়ল। অমল এবং ভ্রমর খাবারঘরে হঠাৎ একলা হল। ভ্রমরকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আছে। অমল বলল, "তোমরা শুয়ে পড়, মাসিমারা না ফেরা পর্যন্ত আমি জেগে থাকব।"...ভ্রমর সামান্য চোখ তুলল. "তুমি পারবে না; আয়া জেগে থাকবে।"

ভ্রমর রাগ করে নি, তাকে খারাপ কিছু ভাবে নি বুঝতে পেরে অমল আর ভয় পাচ্ছিল না, তার কোনো অস্বস্তিও তেমন হচ্ছিল না। অন্যায়বোধ তার চেতনায় আপাতত তেমন কিছু ছিল না।

এক ধরনের তীব্র নেশার মতন, অথবা কোনো অসাধারণ সুন্দর স্বপ্ন দেখার মতন অমল তার ভালবাসার মাদকতায় এবং স্বপ্নে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো অনুভূতিই তার কাছে স্বাভাবিক মাত্রায় ধরা দিচ্ছিল না। সে বিহ্বল হয়েছিল, উতলা হয়েছিল। ভালবাসার বিচিত্র এবং বিভিন্ন অনুভূতিগুলি তার কাছে জটিল ও অতিরিক্ত হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সে যখন অতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করছে, তখন সে কি কারণে যেন বেদনাও অনুভব করছিল, ভ্রমরের

চিন্তায় সে কখনো পূর্ণতা বোধ করছিল; পরক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল তার কেমন ফাঁকা লাগছে সব। একই সময়ে তৃপ্তি ও বেদনা, আনন্দ ও নিরানন্দ অনুভব করার পরও তার চিন্তা ভ্রমরকে কেন্দ্র করেই ঘড়ির কাঁটার মতন ঘুরছিল। ভ্রমরের শরীরের গন্ধ, ভ্রমরের স্পর্শ, সান্নিধ্যলাভের জন্য তার ইন্দ্রিয়গুলি অস্থির হচ্ছিল। কতকগুলি বাসনা সে অনুভব করছিল। মধুর এবং অনির্বচনীয় একটি স্বাদে তার মন এই রাত্রে আচ্ছন্ন থাকায় অমলের ঘুম আসছিল না, সে জেগে ছিল।

ভ্রমরও জেগে ছিল। সে আজ চঞ্চল বা অস্থির হয় নি। তার মনে এই মুহূর্তে কোনো বিক্ষিপ্ততা ছিল না। সে শান্ত হয়ে শুয়ে ছিল; কিছু-সুখ কিছু-বেদনায় আনত ও নম্র হয়ে সে যেন একটি অন্য জগতের দিকে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, ভ্রমর অনেকক্ষণ আগে কোনো নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল, স্থানটি তার কাছে বড় সুন্দর ও মনোরম লেগেছিল, সে মুগ্ধ উন্মনা হয়ে পড়েছিল, তারপর আবার এক সময় জায়গাটি ছেড়ে ফিরে এসেছে। ভ্রমরের মনের এই অবস্থাটির সঙ্গে একটি নৌকোর তুলনা করা চলে। যেন নৌকোটি কোনো কূল না পেয়ে অবিরত ভেসে বেড়াচ্ছিল, ভেসে বেড়াতে বেড়াতে কোনো একটি সুন্দর ঘাট পেয়ে গিয়েছিল, ঘাটে নৌকো বেঁধে ফেলেছিল, কিন্তু কিছু সময় পরে আবার ভ্রমর দেখল, সে ভেসে চলেছে, সুন্দর আশ্রয়টি তার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

অমলকে আজ ভ্রমরের আরও ভাল লাগছিল। কেন লাগছিল ভ্রমর স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, অমল তার বড় আপনার। এত আপনার জন তার আর কেউ নয়। অমলের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তার জীবনে তেমন পাওনা ছিল না। ভালবাসা পাওয়ার ভাগ্য সে কোনোদিন করে নি। মা মারা গিয়েছে এমন বয়সে যখন ভালবাসা বোঝার বয়স তার হয় নি। যখন বয়স হল, তখন থেকে সে হিমানী-মা'র নিস্পৃহ অভিভাবকত্ব সহ্য করছে, সে বাবার কর্তব্যপালন দেখেছে; কৃষ্ণা কখনও তার দুঃখ কষ্ট একাকিত্বে গা লাগায় নি। সংসারে যা ভালবাসা, যা বোঝা যায়, যা নিয়ে রাগ অভিমান আব্দার করা চলে তেমন ভালবাসা ভ্রমর কারও কাছ থেকে কখনও পায় নি। বাবার ওপর ভ্রমর মনে-মনে অপ্রসন্ন ছিল। বাবা তার মাকে দুঃখী করেছে, বাবা তাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে হিমানী-মা এবং কৃষ্ণাকে ঘরে এনেছিল। বাবার এই কাজ নিষ্ঠুরের মতন। বাবা তার কথা ভাবে নি। বাবা মা'র দুঃখের কথা ভাবে নি। হিমানী-মাকে ভ্রমর চিরটাকাল মনে মনে অপছন্দ করে এসেছে। তার মনে হত, হিমানী-মা আত্মসুখী; হিমানী-মা দয়া-মায়া-মমতাহীন; হিমানী-মা এই সংসারে অন্যায়ভাবে ঢুকে পড়েছে। কৃষ্ণাকেও ভ্রমর ভালবাসতে পারত না।...তার ইচ্ছে করত, সে মনের এই সব কালিমা রাখবে না, সে সকলকে ভালবাসবে; সে তার বাবা এবং মা'র বিচার করবে না, সে বাবা-মাকে ভক্তি করবে, ভালবাসবে—কিন্তু ভ্রমর পারত না। পারত না বলে তার দুঃখ ছিল। যীশুর কাছে কতবার ভ্রমর এই ভালবাসার মন ও সহনশক্তি চেয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করেছে।

অমলকে আজ সেই রকম একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল, যে ভ্রমরের জন্যে ভালবাসা নিয়ে এসেছে। এত ভালবাসা অনুভব করাও কত তৃপ্তির, ভ্রমর আজ মনে-মনে তা বোধ করতে পারছে। তার মনে হচ্ছিল, আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই ভ্রমরের। সে বাবা মা কৃষ্ণার কাছেও আর ভালবাসা চায়না। অমল তার সকল দুঃখ পূর্ণ করে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে ভ্রমর সন্ধের ঘটনাটির কথা কথা বেহুঁশ হয়ে ভাবছিল। সে দেখছিল, যা ঘটেছে তা খুব গোপনে এবং সর্বজনের অজ্ঞাতে ঘটেছে। এই গোপনতা তার মনে কোনো রকম ভীতি আনছিল না। ভ্রমর আজীবন গোপনেই সব করেছে, তার ঈশ্বরপ্রেম গোপনে, তার সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য গোপনে, সে বরাবর তার শরীর মন গোপন করেই রেখেছে, গোপনতার এবং নীরবতার মধ্য দিয়েই তার জীবন কেটে যাচ্ছিল। সে কখনও প্রকাশ্যে কিছু চায় নি। গোপনতাই তাকে তৃপ্তি দিত। সে এই নিভৃতিটুকুই পছন্দ করত।

স্বভাববশে ভ্রমর গোপনতাকেই উচিত এবং সংগত বলে মনে করছিল। গোপনতা এক ধরনের পবিত্রতা। মানুষের জীবনের অথবা মনের সমস্ত কিছু প্রকাশ্যে হয় না। হওয়া উচিত নয়। সুন্দর সৃষ্টির ও ভালবাসার খুব কম জিনিস প্রকাশ্যে হয়। ফুল কখনও চোখের সামনে পাপড়ি মেলে না, ভ্রমর দেখে নি। চোখের আড়ালেই একদিন ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, জেহোভা আলো আকাশ জল মাটি নক্ষত্র সৃষ্টি করেন যখন, তখন কে তাঁর সৃষ্টি দেখেছিল!

ভ্রমর স্বাভাবিক নারীজনোচিত সতর্কতা এবং মনোভাববশে জীবনের কতকগুলি অনুভূতিকে অত্যন্ত সংগোপনে লালন করতে চাইছিল। অমলের স্পর্শে তাকে কেবলমাত্র পুরুষের ভালবাসা অনুভব করতে দেয় নি, ভ্রমর আরও কিছু-কিছু আশ্চর্য ইচ্ছা অনুভব করেছিল। সেই ইচ্ছাগুলি তাকে মাঝে-মাঝে বিব্রত ও লজ্জিত করছিল। ভ্রমর জোর করে এ-ধরনের ভাবনাকে সরিয়ে দিচ্ছিল। সে কুণ্ঠিত হয়ে ভাবছিল, এ-সব চিন্তা পাপ। নিষিদ্ধ ইচ্ছাগুলিকে ভ্রমর অন্ধকারে ভর্ৎসনা করছিল।

ভ্রমরের আজকের চেতনা অতিরিক্ত রকম বিস্তৃত ছিল। যেন সমুদ্র। সেখানে কোনো ঝড় বা ঢেউ উঠবে না, এমন নয়। ভ্রমর কখনও-কখনও ঝড়ে পড়ছিল, ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছিল—তবু সে তার চেতনাকে অমলিন রাখার চেষ্টায় শান্ত হতে চাইছিল। সে বার বার মনে-মনে বলছিল : না, না, না। সে যাকে না বলছিল সে ওই খল সাপ, জেহোভার তৈরী করা উদ্যানে যে ঢুকে পড়েছিল।

মনের কয়েকটি রন্ধ্র ভ্রমর বন্ধ করে দিল। সে সবরকম দৃশ্য দেখতে চাই-ছিল না। যা সুন্দর, যা প্রেম এবং যা পবিত্র বলে ভ্রমর জানে সেগুলি খুলে রাখল, এবং নিজেকে তাদের মধ্যে বিছিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকাল থেকে অমল এবং ভ্রমরের মধ্যে অদ্ভুত এক লুকোচুরি খেলা চলল যেন। ভ্রমর সকালে অমলকে ডাকল, অমল ঘুমোচ্ছিল, উঠল না। ভ্রমর রাগ করল। অমল যখন ঘুম থেকে উঠল, তখন বেলা হয়েছে; তার মনে হল, ভ্রমর তাকে ডাকে নি; অমল অভিমান করল। চা দেবার সময় ভ্রমরই চা করে দিল। হিমানীমাসির কাল ঠাণ্ডা লেগেছে, ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল খুব, রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে ভীষণ ভুগিয়েছে। ঠাণ্ডা লেগে আজ হিমানী-

মাসি শয্যাশায়ী, গা হাত মাথা ব্যথা করছে, চোখ ফুলে গেছে।

চায়ের সময় ভ্রমর দু-চারটি কথা বলল। অমলের দিকে ভাল করে তাকাচ্ছিল না। অমলও কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকল।

একটু বেলায় দুজনে ভাব হল আবার। বাগানে রোদে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ভ্রমর জমাদারকে দিয়ে মাঠ পরিষ্কার করাচ্ছিল। সামনে ক্রীশমাস। অমল পায়চারি করছিল, ফুল দেখছিল সকালের; রোদ দেখছিল, আকাশ দেখছিল; সব যেন আজ দেখার মতন।

কৃষ্ণা যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন আবার দুজনে আলাদা হয়ে গেছে। ভ্রমর কি বলেছিল যেন, অমল কান করে শোনে নি। না শুনে অমল অকারণে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। ভ্রমর খুব রাগ করেছিল।

দুপুর বেলায় আবার অন্য রকম হল। ভ্রমরের ঘরে মধ্যবেলার রোদ ছিল, বিছানার পায়ের দিকে রোদের কণা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরছিল, একটি চড়ুই ঢুকে ফরফর করে উড়ছিল, পালিয়ে যাচ্ছিল, ভ্রমর বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল। তার গায়ে চাদর। মাথার চুলগুলি বালিশের পাশে ছড়ানো ছিল। অমল কখন চোরের মতন ঘরে ঢুকে ভ্রমরের চোখের পাতায় ফুঁ দিল। ভ্রমর জেগে উঠল। চোখের সামনে অমলের মুখ দেখে চমকে যেন বালিশ থেকে মাথা তুলে উঠে বসল। গায়ের চাদরটা টেনে নিল সামান্য।

অমল দুষ্টুমির চোখে হাসছিল, তার মুখ চকচক করছিল রোদে। "খুব ঘুমোচ্ছ!" অমল বলল, "বেশ মজায় আছ!"

ভ্রমরের রাগ হয়েছিল সামান্য। সে এই মুহূর্তে একটা স্বপ্নই যেন দেখতে যাচ্ছিল, অমল এসে ভাঙিয়ে দিল। ভ্রমর বলল, "ঘুম পেলে ঘুমোব না!"

অমল বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল, লোহার স্প্রিং দুলে উঠল। দু-দিকে দু-হাত রেখে অমল ছেলেমানুষের মতন স্প্রিং নাচাতে লাগল, বলল, "তুমি কি করে ঘুম মারছ কে জানে! আমি ঘুমোতে পারছি না।

ভ্রমর পা গুটিয়ে নিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। হাত আড়াল করল মুখের কাছে। একটু হাই উঠল। "আমি অনেক সকালে উঠেছি।"

"তাতে কি! আমি কাল সারা রাত ঘুমোই নি।"

ভ্রমর অমলকে দেখল এক পলক। সে যা ভাবছিল তা বলল না, বরং ঠাট্টা করে বলল, "জাগন্ত মানুষকে আজ সকালে দেখেছি।"

অমল বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে বলল, "শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে ওরকম হয়।...তোমার মতন 'আয় ঘুম' করলে আমার ঘুম আসে না।"

ভ্রমর কিছু বলল না। বাইরে কয়েকটা পাতা উড়ে-উড়ে পড়ল গাছ থেকে। সনসন করে বাতাস বয়ে গেল এক দমক। আজ সকাল থেকে বাতাসটা শান্ত হয়েছে অনেক। কুয়া থেকে জল তুলছে আয়া। চাকার শব্দ ভেসে আসছে, আয়াকে দেখা যাচ্ছে না।

"তাস খেলবে?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"তাস!" ভ্রমর মুখ ফেরাল।

অমল জামার পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের করল, নতুন প্যাকেট। বলল, "কিনে এনেছি। এস দু-হাত হয়ে যাক।"

"আমি তাস জানি না।" ভ্রমর বলল। বুঝতে পারল, আজ যখন অমল

সকালবেলায় বাইরে গিয়েছিল তখন এইসব করেছে, তাস কিনেছে, সিগারেট খেয়েছে, আরও কি কি করেছে কে জানে!

"তুমি কিছুই জানো না।" অমল ঘাড় উলটে কেমন একটা ভঙ্গি করে বলল, "যা বলব, অমনি বলবে আমি জানি না।...ধ্যাৎ, পয়সাটা গচ্চা গেল!"

"কে বলেছিল কিনতে?"

"কিনলাম।...দুপুরে খেলব বলে কিনলাম।" অমল বলল। ভাবল একটু, তারপর ভ্রমরকে চোখে-চোখে দেখল, বলল, "আমি দু-হাতে টুয়েণ্টিনাইন খেলার একটা কায়দা জানি। তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।"

ভ্রমর মাথা নাড়ল। "না। তাস আমি খেলব না।"

"কেন?" অমল অবাক হল।

"বাড়িতে তাস খেললে মা তোমায় কান ধরে গেটের বাইরে বের করে দেবে।" ভ্রমর গম্ভীর হয়ে বলতে চাইল, কিন্তু পারল না, হেসে ফেলল।

অমল বোকা হয়ে গেল। সে কিছু বলতে পারল না। আসলে তাস-টাস কিছুই নয়; অমল নিজেও তাস খেলতে জানে না টুয়েণ্টিনাইন ছাড়া; কিন্তু তাসটা সে কিনেছিল ভ্রমরের কাছে বসে সময় কাটাবার জন্যে। শুধু-শুধু একজনের মুখের সামনে বসে থাকতে কেমন লাগে, বসে থাকার কৈফিয়তও যেন থাকে না। তাস থাকলে খেলার নাম করে বসে থাকা যায়, গল্প করা যায়। কিন্তু সে জানত না এ-বাড়িতে তাস নিষিদ্ধ।

কেমন ক্ষুণ্ণ হয়ে অমল বলল, "তোমাদের বাড়িতে সবই বারণ। তাস তো ইনোসেণ্ট খেলা!"

"মাকে বলো। ভ্রমর আড়চোখে অমলকে দেখল, ঠোঁট টিপে হাসল।

অমল তাসের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। কি করবে ভাবছিল যেন। শেষে হঠাৎ কি খেয়াল হল, জানলা দিয়ে তাসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে মাঠে ফেলে দিল। দিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "ঠিক আছে। আমি আর কিছু আনব না। প্রমিস করছি...।" বলে অমল উঠে পড়ল। এবং ভ্রমরকে অবাক করে ঘর ছেড়ে চলে চলে গেল। আর এল না।

ভ্রমর অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল। সে অপেক্ষা করল। তার মনে হল, অমল ফিরে আসবে। অমল এল না দেখে ভ্রমরের খুব খারাপ লাগল। তার সমস্ত মন দুপুর বেলায় খাঁ-খাঁ করতে লাগল। জানলার বাইরে উদাস দুঃখিত চোখে তাকিয়ে সে বাকি দুপুরটুকু মরে যেতে দেখল।

বিকেলবেলায় অমলকে বাড়িতে দেখা গেল না। সে সাজগোজ করে কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে গেল, কে জানে! ভ্রমরকে কিছু বলে নি। খুব রাগ করেছে অমল।

বিকেল পড়ে আসার পর ভ্রমর আজ একটু আলাদা করে চুল বাঁধলো, বাটির মতন খোঁপা করল, কাঁটা গুঁজল। নতুন একটা শাড়ি ভাঙল এবং যে-শাড়িটা তার নিজের খুব পছন্দ, নীল রঙ, চিকনের কাজ—সেই শাড়িটাই পরল, গায়ে পুরো-হাতা সোয়েটার দিল, ছোট শাল রাখল পিঠে। মুখে অল্প করে পাউডার মাখার সময় তার কি খেয়াল হল, সে কৃষ্ণার ঘর থেকে সুর্মা এনে

চোখের কোণে অল্প করে ছোঁয়াল।

সন্ধের গোড়াতেই বোঝা গেল, আজকের শীত কালকের মতনই। বাতাস ছিল না বলে গায়ের চামড়া সকাল থেকে কেটে যাচ্ছিল না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শীতটা যেন জমার অপেক্ষা করছিল। সন্ধের গোড়ায় শীত জমে গেল। ঘরের মাটি থেকে কনকন করে ঠাণ্ডা উঠছিল, বাইরের শূন্যতা থেকে হিম যেন সর্বক্ষণ ভেসে আসছিল, কুয়াশা থিকথিক করছিল সর্বত্র, আকাশের তারা দেখাচ্ছিল না।

অমল ফিরছিল না। বাড়িতে বাতি জ্বলে উঠল, জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আয়া ঘরে-ঘরে আগুনের পাত্র দিল—তবু অমল ফিরল না। মা তাঁর ঘরে, বিছানায় শুয়ে। দুপুর থেকে জ্বর এসে গেছে। ভীষণ সর্দি হয়েছে। কপালে উইণ্টোজেন মেখে, লেপের মধ্যে শুয়ে মা বাবার সঙ্গে কথা বলছে। বাবা কলেজের কাজ করছে। কৃষ্ণার কাল শেষ পরীক্ষা। জিওগ্রাফি। সে পড়তে বসে গেছে।

ভ্রমর উদ্বেগ বোধ করল। এই ঠাণ্ডায়, এতটা অন্ধকারে অমল যে কোথায় একলা-একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বুঝতে পারছিল না। অমল বড় রাগী, তার রাগের কোনো জ্ঞান নেই যেন। এই ভীষণ ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়ানোর কোনো দরকার ছিল না। ঠাণ্ডা লেগে ঠিক অসুখ বাঁধাবে। ভ্রমর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না।

ভ্রমর যখন বেশ উদ্বিগ্ন এবং প্রতি মুহূর্তে অমলের পায়ের শব্দ গুনছে তখন অমল ফিরল। শীতে হিহি করে কাঁপছে, গলার মাফলার পাগড়ির মতন করে মাথায় বেঁধেছে কান চাপা দিয়ে, হাত দুটো কোটের পকেটে। নাকে জল, চোখ ছলছল করছে।

মনে-মনে ভ্রমরের অভিমান হয়েছিল। সারা বিকেল, সন্ধে উনি পথে-পথে ঘুরে এলেন, যেন বাড়িতে কেউ নেই। ভ্রমরের এতটা সময় কি করে কাটল অমল দেখল না।

ভ্রমর নিজের ঘরেই ছিল, অমল কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকে বলল, "আজ বাইরে বরফ পড়ছে।" বলে ভ্রমরের দিকে এগিয়ে এল, "আমার হাত দুটো কি-রকম হয়েছে দেখবে—?" ভ্রমরের সামনে দাঁড়িয়ে অমল তার হাত ভ্রমরের গালে ছুঁইয়ে দিল।

ভীষণ ঠাণ্ডা। ভ্রমরের মনে হল, এক টুকরো বরফ কিংবা কনকনে জল কেউ ওর মুখে ছুঁইয়ে দিয়েছে। কেঁপে উঠল ভ্রমর। অমল হাত সরিয়ে নিল। নিজে দু-হাত ঘষতে লাগল, হাত ঘষতে-ঘষতে মালসার আগুনের কাছে এসে বসল। আগুনে হাত সেঁকতে লাগল উবু হয়ে বসে।

কথা বলব-না বলব-না করেও ভ্রমর কথা বলল। গলা গম্ভীর করে বলল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

"বেড়াতে।"

"এতক্ষণ বেড়াচ্ছিলে?"

"ঘুরছিলাম। চকবাজার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।" অমল বলল, যেন সে আর কিছু করার পায় নি, বাজারে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সামান্য থেমে অমল আবার বলল, "বাড়িতে থেকে কি লাভ। বোবা হয়ে বসে থাকতে হবে।

নয়ত লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে হবে।"

ভ্রমর বুঝতে পারল দুপুরের রাগের জের টানছে অমল। হয়ত রাগ করেই এ-রকম ঠাণ্ডা খেয়ে এল।

ভ্রমর বলল, "তুমি বোবা হয়ে বসে থাক কবে?"

"থাকি। দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা থাকি।"

"হিসেব করেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। হিসেব না করে দুমদাম কথা আমি বলি না। আমি মেয়েদের মতন নই।" অমল মুখ ফিরিয়ে ভ্রমরকে দেখতে দেখতে বলল।

হাসি পেয়ে গিয়েছিল ভ্রমরের। কষ্ট করে হাসি চেপে ভ্রমর বলল, "মেয়েরা হিসেব করে কথা বলে না?"

"বাজে কথা বলে। সেন্স্‌লেস কথা বলে।"

ভ্রমর এবার হেসে ফেলল। তার গলায় ঢোঁক গেলার মতন সুন্দর শব্দ হল। গালে চোখে হাসি কাঁপছিল। ভ্রমর বলল, "তুমি মেয়েদের কি জানো?"

অমল আগুনের ওপর থেকে হাত উঠিয়ে নিজের গালে রাখল। সে ঝুঁকে বসেছিল বলে আগুনের তাত তার মুখেও অল্প-অল্প লাগছিল। ঠাণ্ডা মুখ গরম হয়ে এসেছিল। তপ্ত হাত গালে দিয়ে অমল আরও একটু উষ্ণ করল তার মুখ। ভ্রমরের কথার জবাব দিল না। সে ভাবছিল, কি বলবে, কি বলা যায়।

ভ্রমর সামান্য অপেক্ষা করল। সে যখন অপেক্ষা করছিল তখন তার মনে কেমন অন্য ভাবনা এল হঠাৎ। ভ্রমর ভাবল, অমল হয়ত বলবে সে মেয়েদের একটা বড় জিনিস জানে। ভ্রমর কেমন কুণ্ঠিত হল।

আগুনের কাছ থেকে অমল উঠল। তার মাথা-কান জুড়ে আর মাফলার বাঁধা নেই, গলায় জড়ানো। ভ্রমরের দিকে তাকাল অমল। তার মুখে রাগ নেই, শীতের অসাড় ভাবটাও নেই। এগিয়ে আসতে আসতে অমল বলল, "আমি একটা মেয়েকে জানি।" বলে অমল একটি আঙুল তুলে ঠোঁট চেপে হাসল।

ভ্রমর গায়ের চাদর বুকের কাছে জড়িয়ে নিল আরও। তার বুক একটু কেঁপে উঠল, গা শিরশির করল। বিছানার মাথার দিকে উঠে গুটিয়ে বসল।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে অমল বলল, "আমি যখন ফিরে যাব, বাড়ি থেকে চিঠি লিখে তোমায় সেই মেয়েটার কথা বলব।"

কথাটা অমল যত সহজে বলেছিল ভ্রমর তত সহজে শুনল না। তার হঠাৎ মনে হল, আর ক'দিন পরে তার ঘরে এমনি করে কেউ আসবে না, কেউ তার গালে ঠাণ্ডা হাত ছুঁইয়ে দেবে না, তাস কিনে এনে খেলতে বলবে না, রাগ করবে না। ভ্রমর অনুভব করতে পারল, তার বিছানায় বসে কেউ চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যে তাকে কাছে টেনে নেবে না। কেউ ঠাট্টা করে গাইবে না, 'ঘরেতে ভ্রমর এল...'। কথাগুলো মনে আসতেই হঠাৎ কেমন সব ফাঁকা হয়ে গেল, যেন ভ্রমরকে কেউ দু-হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরে শীতে এবং অন্ধকারে ফাঁকায় বসিয়ে দিল।

অমল বিছানায় বসেছিল। হাঁটুতে হাত রেখে পা দোলাতে-দোলাতে অমল ভ্রমরের দিকে তাকাল। বলল, "সেই মেয়েটার জন্যে আমার—আমার খুব খারাপ লাগবে।"

ভ্রমর মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মুখ ক্রমশ মলিন ও করুণ হয়ে

আসছিল। নিশ্বাস ভারী হয়ে গিয়েছিল।

"ভ্রমর, কাল আমার ঘুম হচ্ছিল না, কত কি ভাবছিলাম। খুব ভাল লাগছিল। আজ বিকেল থেকে আর কিছু ভাল লাগছিল না—" অমল মৃদু গলায় মুখ নীচু করে বলল। সে আর পা দোলাচ্ছে না। তার মুখের চেহারা দুঃখীর মতন হয়ে উঠেছে।

ঘর হঠাৎ নীরব এবং স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল, কোনো অনন্ত সমুদ্রের আলো-ঘরে দুটি পাখি বসে আছে। তারা আজ অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু তাদের কাল সকালে ভিন্ন পথে উড়ে যেতে হবে। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতন একটি আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠল ঘরে। অমল মুখ হাঁ করে শ্বাস ফেলল।

অনেকক্ষণ পরে ভ্রমর অতি মৃদু গলায় বলল, "তুমি আর আসবে না?"

"আসব। আমার আসতে ইচ্ছে করবে খুব।...কিন্তু তুমি বড় দূরে থাক।" কথাটা বলার পর অমলের কেন যেন মনে হল, ভ্রমর তার এত কাছে—তবু কত দূর-দূর মনে হচ্ছে আজ।

ভ্রমর ডান হাত ওঠাল, চিবুকের কাছে আনল, ঠোঁটের ওপর আঙুল রগড়াল, বলল, "আমাদের খুব কাছে কোনো ভাল জিনিসই থাকে না, না? ভগবানও কত দূরে..."

অমলের বুক হঠাৎ শূন্য, একেবারে শূন্য হয়ে গেল এখন। বুকের মধ্যে কোনো কিছুই সে অনুভব করতে পারছিল না। তার গলা বুজে আসছিল, কান্না আসছিল। অমল বলল, "ভ্রমর, আমি রোজ তোমার কথা ভাবব, আমি ঘুমোবার সময় তোমায় ভাবব।...স্বপ্নে তোমায় দেখতে পাব।"

ভ্রমরের ঠোঁট ফুলে উঠেছিল, যন্ত্রণায় গলা টনটন করছিল, কণ্ঠস্বর বুজে গিয়েছিল। ভ্রমর কোনোরকমে বলল, "আমি তোমার জন্যে রোজ প্রার্থনা করব। রোজ।"

ওরা আর কোনো কথা বলল না। বলতে পারল না।

৮

ক'দিন ধরে বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ চলছিল। সামনে ক্রীশমাস। হিমানী নিজে দেখাশোনা করছিলেন। কথা ছিল বাড়ি চুনকাম হবে। কলেজ থেকে আনন্দমোহন লোক পেলেন না; কলেজে কিছু কাজকর্ম হচ্ছিল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোয়ার্টারে আসতে পারবে না। হিমানী ভেবেছিলেন বাড়ির কাজগুলো ক্রিশমাসের আগে শেষ হয়ে যাবে, না-হওয়ায় তিনি অখুশী হয়েছেন। আনন্দমোহন অবশ্য বলেছিলেন যে, মিস্ত্রী মজুর একবার বাড়িতে ঢোকালে তারা সহজে বেরুতে চায় না, এ বরং ভালই হয়েছে, পরে আসবে। এ-বাড়িতে কাজও অনেক, চুনকাম শুধু নয়, মেরামতির কাজও রয়েছে, দরজা জানলা সারা আছে, রঙ রয়েছে। তিন বছর অন্তর একবার করে কোয়ার্টারে মিস্ত্রী মজুর ঢোকে, যেখানে যা করার ওই একেবারেই করিয়ে নিতে হবে, নয়ত পড়ে থাকবে।

আয়া একা পেরে উঠছিল না। একটা মেয়ে ধরে এনেছিল, কমবয়সী। সে ঘরের ঝুল ঝাড়ল ঝুলকাঠি মাথায় তুলে, মেঝে ঘরদোর পরিষ্কার করল, এটা ওটা ফরমাস খাটল, যাবার সময় ভ্রমরের গায়ের গরম স্কার্ফটা চুরি করে নিয়ে চলে গেল।

কথাটা ভ্রমর গোপন রেখেছিল। অমলকে শুধু বলেছিল আড়ালে। অমল হাসিঠাট্টা করেছিল খুব : 'শীতের দিনে গরম বস্ত্র দান করা পুণ্যকাজ, বুঝলে ভ্রমর। তোমার অনেক পুণ্য হল।' পরের দিন ধোবী এসেছিল। নিজের জামা-কাপড় কাচতে পাঠাবার সময় অমল অবাক হয়ে দেখল, তার একটা সুতির শার্ট, একটা গেঞ্জি এবং ময়লা পাজামাটা বেপাত্তা।

চুরির কথাটা বাড়িতে জানাজানি হলে হিমানী আয়াকে গালমন্দ করতেন। ভ্রমরও তার স্কার্ফ খোওয়া যাওয়ার জন্যে মা'র বকুনি শুনত। বেচারী টিসরির কথা ভেবেই চুরির ঘটনাটা ওরা চাপা দিয়ে রাখল। আয়াকে ভ্রমর পরে কথাটা বলল, অমলের জামাটামা চুরির যাবার পর।

সেদিন দুপুরবেলা টিসরি তাড়াতাড়ি বাড়ির কাজ সেরে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। দিনটা ছিল রবিবার। কোনো-কোনো রবিবারে আয়া কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিত, সাধারণতঃ দুপুরের দিকে, হিমানীরা গির্জা যাবার সময়-সময় ফিরে আসত। এবারে বিকেল হবার মুখে-মুখে চলে গেল। ভ্রমররা বাড়িতে থাকবে জেনে তার ফেরার গা ছিল না তাড়াতাড়ি। ভ্রমর অন্তত বিকেল হয়ে

গেছে দেখে সেই রকম ভাবছিল সেদিন।

হিমানী আনন্দমোহন কৃষ্ণা গির্জা চলে গিয়েছিলেন। আজ গির্জা থেকে বেরিয়ে হিমানীরা আসবেন বাজারে, ক্রীশমাসের অনেক কেনাকাটা আছে। শীতের কথা ভেবে সবাই বেশ সাবধান হয়ে বেরিয়েছেন। আনন্দমোহন তাঁর মোটা ওভারকোটটা হাতে নিয়েছেন; হিমানী গরমজামা গায়ে দিয়েছেন, পায়ে মোজা পরেছেন, শাল নিয়েছেন, কৃষ্ণাও তার পুরোহাতার গরম কোট নিয়েছে, মাথায় বাঁধার স্কার্ফ নিয়েছে।

ভ্রমরের গির্জায় যাবার ইচ্ছে ছিল। অসুখে পড়ে তার গির্জা বন্ধ হয়েছে। আনন্দমোহন সাহস করে নেন নি। ভ্রমরের শরীর না সারা পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ি করে দশ মাইল পথ এই ঠান্ডায় তাকে আসা-যাওয়া করতে দিতে তিনি রাজী নন। সামনে ক্রীশমাস; আর ছ'সাতটা দিন। ভ্রমর এ-সময় সুস্থ থাকুক।

বাড়ি একেবারে ফাঁকা। বিকেলের শুরু আর শেষ চোখে দেখা গেল না। পৌষের আকাশ থেকে সন্ধ্যার জোয়ার এসে গেল। পাখিগুলি কিছুক্ষণ শূন্যে এবং বৃক্ষচূড়ায় তাদের কলরব ভরে রাখল, তারপর সর্বত্র একটি নীরবতা নামল ক্রমশ। হিম এবং কুয়াশা অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে এল।

আয়া ফিরছে না। ভ্রমর বিকেলের পোশাক বদলে ঘরে-ঘরে বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। অমল দরজা জানলাগুলো বন্ধ করছিল ভ্রমরের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে। বাতি জ্বালানো হয়ে গেলে ওরা রান্নার ঘরের দিকে গেল। একটা লোহার উনুন আয়া জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল, সে-আগুন নিবে গেছে। ভ্রমর ভাবছিল, কোনো রকমে একটু আগুন জ্বালানো যায় কিনা। এই কাজটা সে পারে না। অমল বলছিল, সে পারবে; পিকনিকে গিয়ে তারা কতবার মাঠে ঘাটে পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়েছে।

"তুমি আমায় কেরোসিন তেল কোথায় আছে বলো, আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। কাঠ দিয়ে আগুন ধরানো খুব ইজি।" অমল বলল।

ভ্রমর আগ্রহ বোধ করল না। বলল, "থাক; আর খানিকটা দেখি। আয়া ফিরবে এখুনি।"

"যখন ফিরবে তখন ফিরবে—আগুনটা আমরা ধরিয়ে দি। তোমার ঘরে আগুন রাখতে হবে। আমি চা খাব।" অমল বেশ উৎসাহের সঙ্গে আগুন জ্বালাবার তোড়জোড় শুরু করল।

ভ্রমর বলল, "তুমি অত হুড়োহুড়ি করছ কেন? একটু সবুর করা যায় না!"

"সবুরে মেওয়া ফলবে নাকি!" অমল ঠাট্টা করে বলল, "বসে থাকলে আগুন জ্বলবে না।" বলে রান্নাঘরের বাইরে থেকে শুকনো কাঠ আনতে গেল।

আয়ার ওপর রাগই হচ্ছিল ভ্রমরের। কখন গেছে, এখনও ফেরার নাম নেই। কোথায় গেছে তাও বলে যায় নি। সারা বাড়ির কাজকর্ম ফেলে চলে গিয়ে সে কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে ভ্রমর বুঝতে পারছিল না। আয়া এ-রকম লোক নয়।

ভাবতে ভাবতে আয়া এসে গেল। অমল যখন সত্যি-সত্যি কেরোসিন তেলের বোতল কাঠের ওপর উপুড় করে ঢেলে দিয়ে দেশলাই কাঠি দিয়েছে এবং মুহূর্তে একটি ভয়ংকর অগ্নিশিখা দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সেই সময় আয়া পৌঁছে গেল। আয়া এসে না পড়লে আগুনটা সামলানো দায় হয়ে উঠত।

ভ্রমর রাগ করেই কিছু বলতে যাচ্ছিল আয়াকে, কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হল কিছু যেন হয়েছে একটা; ভ্রমর সামান্য অনুযোগ করল, কিছু বলল না আর।

অমল হাত ধুতে চলে গেল।

আগুন উঠোতে, মালসায় কাঠকয়লা তুলতে, চা করতে খানিকটা সময় গেল। ততক্ষণে সন্ধে পেরিয়ে গেছে। অমল তার নিজের ঘরে ছিল। ভ্রমর এসে ডাকল, "এস। তোমার চা হয়েছে।"

ভ্রমরের ঘরে এসে বসল অমল। মালসায় আগুন দেওয়া হয়েছে। দরজা বন্ধ, ঘর এখনও ঠাণ্ডা হয়ে আছে। এ ক'দিনে ভ্রমরের ঘরের চেহারা আরও কিছুটা বদলেছে। আয়না এসেছে, মেরীর ছবি এসেছে, ড্রয়ার বসেছে এক-পাশে।

ভ্রমর বলল, "আয়া কোথায় গিয়েছিল জানো?"

"কোথায়! গির্জায়?" অমল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল হালকা গলায়।

"ইয়ার্কি করো না।" ভ্রমর ধমক দেবার মতন গলা করল।

"ইয়ার্কি'র কি! আমি ত তোমায় আগেও বলেছি, আজ হয়ত ও ওদের গির্জায় গেছে।"

"গির্জায় যায় নি। সেই মেয়েটার বাড়ি গিয়েছিল খুঁজে খুঁজে। অনেক দূর।"

"চোর মেয়েটার!" অমল অবাক হয়ে তাকাল, "ধরতে পেরেছে?"

"আয়া বসে থেকে থেকে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করেছে।"

"কি বলল মেয়েটা? চুরি করে নি?"

"চুরি করেছে।" ভ্রমর বলল, বলে কয়েক মুহূর্ত কেমন নীরব থাকল। "আয়া তার কাছ থেকে সব ফেরত নিয়ে এসেছে।"

অমল লক্ষ করে বুঝল, ভ্রমর তার খোয়া-যাওয়া জিনিস ফেরত পাওয়ায় মোটেই খুশী নয়। তার মুখে তৃপ্তি নেই। চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, ভ্রমর যেন কিছু বলতে চাইছে। অমল খানিকটা চা খেল। বলল। "তুমি বেঁচে গেলে! মাসিমা যেদিন জানতে পারত তোমায় কাঁদিয়ে ছাড়ত।"

ভ্রমর চা খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ সে কোনো কথা বলল না। শেষে বলল, "আমি আয়াকে বলেছি, সব জিনিস আবার কাল দিয়ে আসতে।"

অমল রীতিমত অবাক হল। তার শার্ট বা পাজামার জন্যে সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত ছিল না, কিন্তু চুরি-যাওয়া জিনিস ফেরত পেয়ে আবার সেটা চোরকে পাঠানোর মর্ম সে বুঝছিল না। তার কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতন লাগছিল। অমল হেসে বলল, "তুমি ত আগেও বলেছিলে, আহা বেচারী গরীব, নিয়েছে নিক, শীতে গায়ে দেবে...।" ঠাট্টা এবং রগড় করেই বলেছিল অমল কথাগুলো। স্কার্ফ খোওয়া যাওয়ার পর থেকে ভ্রমরকে এই ভাবেই ঠাট্টা করে আসছিল সে।

ভ্রমর অমলের হাসিঠাট্টা গায়ে মাখল না। বলল, "মেয়েটা খুব দুঃখী। আয়া বলছিল, বিয়ে হয়েছে ক'মাস আগে। স্বামী কাঠকারখানায় কাজ করত, হাত কেটে ফেলেছে মেশিন-করাতে। চাকরি নেই। মেয়েটা এখানে-ওখানে

কাজ করে যা পায় তাতেই চলে...।" ভ্রমর নিশ্বাস ফেলল।

অমল কৌতূহল অনুভব করল, বলল, "মেয়েটা ত ওইটুকু! ওর আবার বিয়ে।"

ভ্রমর জবাব দিল না। মেয়েটা আঠারো-উনিশ বছরের হবে। অমল কেন ওইটুকু বলল সে বুঝতে পারল না। রোগাটে বলে নাকি?

"হাত কি একেবারে দু-আধখানা হয়ে গেছে লোকটার?" অমল শুধলো।

ভ্রমর আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, "একটা আঙুল একেবারে কেটে গেছে, বড় জখম।"

"তা হলে আবার চাকরি পাবে।"

চায়ের কাপ ভ্রমর গোল টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখল। সরিয়ে রেখে বিছানায় মাথার দিকে পা চাপা দিয়ে বসল।

অমল কি বলবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলল, "তুমি যাই বলো, মেয়েটা খুব হিসেবী চোর, হিসেব করে করে জিনিস নিয়েছে। নিজের জন্যে গরম স্কার্ফ আর তার বরের জন্যে শার্ট পাজামা—।" কথাটা বলে অমল হাসল, কিন্তু হাসতে গিয়েও তার কানে 'বর' শব্দ কেন যেন খচখচ করে বিঁধছিল। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। কি রকম এক অস্বস্তি বোধ করছিল অমল।

ভ্রমর অমলের চোখমুখ লক্ষ করল দু-মুহূর্ত। মনে-মনে কিছু ভাবছিল। মুখে বলল, "ওদের দরকার, ওরা নিক। আমার গরম জিনিস অনেক আছে।"

"তুমি...তোমার কথা আলাদা।" অমল হেসে বলল, "তোমার খুব দয়ামায়া। যীশুর মতন।"

ভ্রমর অসন্তুষ্ট হল। চোখ দিয়ে তিরস্কার করল অমলকে। বলল "ও-রকম কথা আর বলো না।" বলে দু-মুহূর্ত উদাস থেকে ভ্রমর অন্যমনস্ক গলায় আবার বলল, "যীশুর দয়ার শেষ ছিল না! ক্রুশে যাবার সময়ও দয়া তিনি করেছিলেন।"

অমল শেষ চুমুক চা খেল। কাপটা রেখে দিয়ে বলল, "আমি একটা কথা বলি। আমার শার্ট পাজামার জন্যে আমি কেয়ার করি না। মেয়েটা চাইলেই পারত, আমি দিয়ে দিতাম। তুমিও দিয়ে দিতে। ও চুরি করল কেন?"

ভ্রমর চোখে-চোখে তাকিয়ে দেখছিল অমলকে, যেন অমলের কথা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করছিল। সামান্য ভেবে ভ্রমর বলল, "চাইতে সাহস হয় নি। সে ভেবেছিল আমরা দেব না।"

"আমরা দিতাম।"

"সকলে দেয় না।" ভ্রমর শান্ত গলায় বলল, বলে দু-মুহূর্ত থেমে বলল আবার, "দুঃখী মানুষকে সবাই যদি দিত তবে তারা দুঃখী থাকত না।"

অমল সঙ্গে-সঙ্গে আর কিছু বলল না। গা হাত ছড়িয়ে আরাম করে বসল, আধশোয়া হয়ে গালে হাত রেখে ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে থাকল। অমল অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল।

ভ্রমর দু-হাত কোলের ওপর রেখে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলল, "আমরা কাল যখন জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে আসবে মেয়েটা খুব খুশী হবে, হবে না?"

"হবে।" অমল ভাবুকের মতন মুখ করল; তারপর মজার গলা করে বলল,

"সেই মেয়েটার স্বামী আমার জামাটামা পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াবে। যাই বলো ভ্রমর, মেয়েটা নিজের জন্যে একটা মাত্র জিনিস নিয়েছে, শুধু একটা স্কার্ফ, দামী জিনিস, কিন্তু তার হ্যাজবেণ্ডের জন্যে ফুল ড্রেস। গরম স্কার্ফটা তার স্বামীও গায়ে পরতে পারে। পারে না— ?"

ভ্রমর কোনো জবাব দিল না। অমলের কৌতুক সে লক্ষ করছিল, মনে-মনে ভাবছিল।

কথার জবাব না পেয়ে অমল বলল, "মেয়েরা হ্যাজবেণ্ডকে খুব ভালবাসে।" বলে অমল বিজ্ঞের মতন হাসল।

ভ্রমর যেন সামান্য লজ্জা পেয়েছিল। চোখ ফিরিয়ে নিল। তার ছোট পাতলা মুখের কোথাও সঙ্কোচজনিত আড়ষ্টতা ফুটল।

অমল গাল থেকে হাত সরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সিলিং দেখছিল। তার কোমর পর্যন্ত বিছানায়, পা মাটিতে ঝুলছে। সিলিং দেখতে-দেখতে অমল বলল, "আমি কাল একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। তোমায় বলি নি। বলতাম ঠিক! এখন বলব?"

ভ্রমর নীরব থাকল। তার বেড়ালটা কখন দরজার সামনে এসেছিল। মুখ বাড়িয়ে বার কয় ডাকল, ভেতরে এল; আবার চলে গেল। যেন বেড়ালটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে বাড়িতে।

"আমি স্বপ্নটা বলব, কিন্তু ঠাট্টা করতে পারবে না।" অমল সামান্য মাথা ফিরিয়ে ভ্রমরকে আড়চোখে দেখে নিল। অল্পসময় চুপ করে থেকে হাসির গলায় বলল, "কাল আমি মজার একটা স্বপ্ন দেখলুম; একেবারে বিয়ে-ফিয়ের।...আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।" অমল আর বলতে পারল না, লজ্জায় কৌতুকে এবং এক ধরনের অস্বস্তিতে জিনিসটা আরও হালকা করার জন্যে হেসে উঠল।

ভ্রমর অমলকে দেখল। নরম ঘন অথচ সকৌতুক চোখে দেখল কয়েক পলক। তারপর বলল, "ওইটুকু ছেলের আবার বিয়ে!"

'ওইটুকু' শব্দটা ভ্রমর যেন ইচ্ছে করেই বলল। একটু আগে অমল সেই মেয়েটার বিয়ের কথা শুনে 'ওইটুকু মেয়ের' বিয়ে বলে অবাক হচ্ছিল। ভ্রমর যেন এখন তার শোধ নিল। কেন নিল ভ্রমর বুঝল না।

অমল সামান্য ইতস্তত করল, একটু বুঝি মুশকিলে পড়ে গেছে। তার-পর বলল, "ওইটুকু ছেলে মানে কি? আমার এখন বয়স কত তুমি জানো?"

"উনিশ-টুনিশ হবে।" ভ্রমর গাল ঠোঁট টিপে হাসছিল।

"না স্যার, উনিশ আবার আসছে জন্মে হবে। আমি একুশে চলছি। তোমার মতন নয়।"

"একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয় না ছেলেদের।" ভ্রমর চোখ ভর্তি করে হাস-ছিল। হাসির আভায় তার সারা মুখ টলটল করছিল।

"কে বলছে! এখন বিয়ের কথা আমি বলি নি।" বলতে-বলতে অমল উঠে বসল। তার মুখ দীপ্ত, এবং তার কণ্ঠস্বরে এক ধরনের গাম্ভীর্য রয়েছে। ভ্রমরকে একদৃষ্টে দেখতে-দেখতে অমল বলল, "আমি আরও পরের কথা বলছি। তিন-চার-পাঁচ বছর পরের কথা। আমি যখন অ্যাপ্রেনটিস শেষ করে বেরিয়ে এসেছি, চাকরি করছি। তখন আমি বেশ বড। তুমিও বড় হয়ে গেছ

আরও—তখন...” বলতে-বলতে অমল থেমে গেল; তার মনে হল একেবারে অজানতে তার মুখ দিয়ে কি রকম সব লুকোনো কথা যেন বেরিয়ে গেল। অমল থতমত খেয়ে চুপ; হঠাৎ বোবা; জিব আটকে এল যেন। বোকার মতন এবং অপরাধীর মতন ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে ভীষণ অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল অমল।

ভ্রমর নিঃসাড় হয়ে বসে থাকল। তার চোখের পাতা স্থির, দৃষ্টি স্থির। যেন ঠিক এই মুহূর্তে সে চেতনাকে খুব আবিল অস্পষ্ট করে অনুভব করছিল। বুঝল অথচ বুঝল না কথাটা। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল। তার বুকের কোথাও রক্ত ফুলে উঠল, ভ্রমর ব্যথা অনুভব করল; শীতের ঝাপটা খাওয়ার মতন কাঁপুনি উঠল পিঠের কাছটায়। মুখ নীচু করল ভ্রমর।

অমল চোখ তুলে ভ্রমরকে দেখল। ভ্রমর কি রাগ করল? অসন্তুষ্ট হল? বুঝতে পারছিল না অমল। নিজের বিশ্রী বোকামির জন্যে তার অনুশোচনা হচ্ছিল। কেন বলতে গেল কথাটা। পরে, আরও পরে, বাড়ি ফিরে গিয়ে যখন ভ্রমরকে চিঠি লিখত, তখন একবার লিখতেই হত।...কিন্তু অমল মিথ্যে বলে নি, সে সত্যিই কাল বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে। ভ্রমর বিশ্বাস করবে না, নয়ত তার গা ছুঁয়ে শপথ করে অমল বলতে পারত, সত্যি ভ্রমর, আমি কাল স্বপ্ন দেখেছি বিয়ের। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। ট্রেনে এসে উঠলাম। রেলগাড়িতে চড়ে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছি তখন ত জানা কথা, তোমাদের বাড়ি আসছি।

ভ্রমরের মুখে ক্রমশ যেন রক্ত এসে, লজ্জা এসে, অতিগোপনে ইচ্ছা এবং নিভৃত বাসনাগুলি এসে জমে উঠছিল। নিজের এই আশ্চর্য অনুভূতির সুখ সওয়া গেল না বলেই ভ্রমর তার চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে ফেলল। এবং চোখের পাতার তলায় স্বপ্নের ছবির মতন দেখল, সে অমলের স্ত্রী হয়েছে, অমলের স্ত্রী হয়ে সে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে, সোনার মতন গোধূলি যেন তখন। ভ্রমর স্বপ্নের একটি সুন্দর টুকরোর মতন এই দৃশ্যটি দেখল। অমল তাকে আর কিছু দেখতে দিল না। ভ্রমর অমলের গলা শুনতে পেল। অমল বলছিল, “স্বপ্নটপ্ন স্বপ্নই। কি বল ভ্রমর?”

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিল : অমল ভাসা-ভাসা গানের সুর শুনতে পেল। গভীর নিদ্রার মধ্যে মাছি এসে মুখে বসলে যেমন অস্বস্তির সঙ্গে মানুষ সামান্য মুখ সরিয়ে মাছিটা উড়িয়ে দেয়, অমল অনেকটা সেই-ভাবে শেষরাতের নিবিড় সুপ্তি এবং তৃপ্তি নষ্ট হতে দিতে চাইল না, গানের সুর উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। ঘুমিয়ে পড়ল। আবার জাগল সামান্য পরেই। গানের সুর শুনতে পেল। গলা থেকে লেপ টেনে মাথা ঢাকল, পাশ ফিরল। ঘুমিয়ে পড়ল আবার। অকাতর নিদ্রা আর এল না। কখনও ঘুম, কখনও জাগা-জাগা ভাব। অচেতনা এবং অর্ধচেতনার মধ্যে অল্প সময় কাটল। তারপর অমল ক্রমশ জেগে উঠল। চোখের পাতা খুলল মাথার লেপ সরিয়ে।

এখন ঠিক শেষরাত নয়, রাত ফুরিয়ে ভোর হচ্ছে, প্রত্যূষ। ঘরের চার-পাশে তাকিয়ে বোঝার উপায় ছিল না, ভোর হয়ে এল। ঘর অন্ধকার : বাইরের জানলা আঁট করে বন্ধ, চারপাশ হিম-কনকন। বিছানার খোলা অংশ ঠাণ্ডা, লেপের পিঠ ঠাণ্ডা, নিশ্বাস নেবার সময় বাতাসও খুব শীতল মনে হচ্ছিল। ভেতর দিকের জানলা খোলা বলে অমল করিডোরে ঈষৎ আলো আলো ভাব দেখতে পেল। এ-আলো ভোরের ফরসা নয়, বাতির আলো। তবু অমল বুঝতে পারল, এখন ভোর হয়েছে। ভোর হচ্ছে বলেই সে আজ গান শুনতে পাচ্ছে। ভ্রমর বলেছিল, আজ ভোররাতে তাদের গান শুনে অমলের ঘুম ভাঙবে।

অমল এবার কান পাতল; শুনল—বসার ঘর থেকে ভ্রমর এবং কৃষ্ণার গলা ভেসে আসছে, হিমানীমাসি এবং মেসোমশাইও যেন থেমে-থেমে সেই গানে গলা দিচ্ছেন। সমবেতভাবে ওরা গান গাইছে বলে গানটা বেশ শোনা যাচ্ছে, নয়ত যেত না। মনোযোগ দিয়ে অমল শুনতে লাগল : 'রজনী প্রভাত হল, জাগো, মন-বিহঙ্গম, জাগারিল সর্বপ্রাণী হেরি ভানু মনোরম।'...গানের সুর শুনে অমলের কেমন অতি সহজে তাদের দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, দেশে বাউল বৈরাগীরা এইভাবে গান গায়; মনে পড়ে গেল, দুর্গা পুজোর আগে-আগে এক-আধদিন খুব ভোরে হঠাৎ মেজদির গলায় এই ধরনের গান শোনা যায় এখনও। শরৎকাল, সাদা কাচের মতন ভোর, শিউলি ফুল এইসব সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর মনে এসে যাবার পর অমল বুঝতে পারল, ভ্রমররা অনেকটা আগমনীর গানের মতন সুর করে ওই গানটা গাইছে : 'রজনী প্রভাত হল...।'

লেপের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে অমল বসার ঘরের

দৃশ্যটি কল্পনা করতে-করতে গান শুনছিল। ভ্রমরের চেয়ে কৃষ্ণার গলা চমৎকার মানাচ্ছিল এই গানে। হিমানীমাসি এবং মেসোমশাই যখন গানে গলা দিচ্ছেন তখন সমস্ত সুরটাই মোটা ও বাঁকাচোরা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু খারাপ লাগছে না। খারাপ লাগা উচিতও নয়। অমল শুনল ভ্রমররা গাইছে : 'প্রভাত-বন্দনা লয়ে, যীশু-পদে নত হয়ে, পূজ মন এ-সময়ে যীশু-পদ অনুপম।'

ভ্রমরদের যীশু জন্মের উৎসব আজ এই হিম-কনকনে ভোর থেকে শুরু হয়। না, আজ ভোর থেকে কেন, কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে। কাল রাত থেকে এ-বাড়ির অন্য-রকম চেহারা। খুব যে একটা হইচই চলছে তা নয়, তবে সবাই খুব হাসিখুশী, উৎফুল্ল। বাড়িটা যে-রকম উৎসবের চেহারা নিয়েছে তাতে অমলের স্কুল-কলেজের সরস্বতী পুজোর কথা মনে পড়ছিল। সেই দেবদারুপাতা আর গাঁদাফুল দিয়ে বাড়ির বারান্দা সাজানো, সেই লাল-নীল কাগজের লতা ফুল, সোনালী এবং রুপোলী ঘুরনপাত দিয়ে কারুকর্ম। কাল সন্ধে থেকে মোমবাতি জ্বলছে রাশীকৃত, ঠিক যেন দেওয়ালি। সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বসার ঘর। ঝাউপাতার কচি-কচি ডাল ভেঙে ফুল গুঁজে তোড়া করেছে ভ্রমররা; দেওয়ালে সেই তোড়া ঝুলছে। খৃস্ট-র মেহগনি কাঠের মূর্তিটির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে আসে; বড়-বড় লাল গোলাপের তোড়া, পেতলের ঝকঝকে মোমদানে মোমবাতি, ধূপ পুড়ছে এক-পাশে। হিমানীমাসি অতি যত্ন করে দেরাজের মাথার ওপর রাখা মেরীর ছবিটি সাজিয়েছেন। অবিকল প্রতিমা সাজানোর মতন। লতানো গাছের ফুলপাতা দিয়ে যেন চালচিত্রের কাজ করেছেন ছবির পেছনটায়, ছবির তলায় এক থোকা টাটকা ফুল, ছোট-ছোট মোমবাতি, চন্দন ধূপ, ভাঁজ-ভাঙা বাইবেল। বসার ঘরে অন্য পাশে জানলার গা ঘেঁষে ভ্রমর আর কৃষ্ণা কাল সারাদিন ক্রীশমাস ট্রি সাজিয়েছে। অমলও ছিল। অমল প্রায় প্রত্যেকটি সাজানো-গোছানোতেই ভ্রমরদের সাহায্য করেছে, দালালিও করেছে।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অমল দু-মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে ক্রীশমাস ট্রি এখন কেমন দেখাচ্ছে ভাববার চেষ্টা করল। কাল রাত্তিরে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটা টুলের ওপর সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে তার ওপর টবে বসানো গাছ। টবের গা সবুজ কাগজে মোড়া। একটি মাত্র সরু ফার-কাঠি যোগাড় করেছেন হিমানীমাসি কোথা থেকে যেন, ঝাউ চারায় বেঁধে দিয়েছেন। ঝাউ গাছের সরু ডালগুলো জরির ফিতে দিয়ে আগাগোড়া মুড়তে হয়েছে, রুপোলী লেসের চুমকি ঝোলাতে হয়েছে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে, রাঙতা কেটে ঝিকিমিকি তৈরী করতে হয়েছে, এক কৌটো গায়ে-মাখা পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্ণা গাছের মাথায়, পাতায় কোথাও কোথাও পাউডারের গুঁড়ো ধরে সাদা দেখাচ্ছে। আরও কত কি, সোনালী ফাঁপা বল, চারপাশ গোল করে ঘিরে মোমবাতি সাজানো। সত্যি অপরূপ দেখাচ্ছিল।

কৃষ্ণা বলছিল, এ-রকম সুন্দর করে গাছ সাজানো আগে আর হয় নি কখনও। অমল নিজের কারুকর্মে কৃতিত্ব অনুভব করেছিল, কিন্তু ভ্রমর যখন গাছের মাথায় সুন্দর করে একটি বড় তারা জুড়ে দিল তখন অমল আফসোস করে ভেবেছিল, আহা, এই তারাটুকু সে কেন জুড়ে দিল না। ভ্রমর পরে ঠোঁট টিপে হেসে আড়ালে ফিসফিস করে বলল, তুমি কিচ্ছু জানো না। বেথেল-

হেমের তারা ওটা।

অমল বিছানার মধ্যে আরও একটু আলস্য ভাঙল। তার ঘুম ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু শীতের কথা ভেবে গা উঠছিল না। এখনও সূর্য ওঠে নি। বাইরে নিবিড় কুয়াশা হয়ে রয়েছে, ঘন পুঞ্জীভূত সাদা ধোঁয়ার মতন, তুষারকণা জমে আছে শূন্যে, ফরসা সাদা সিক্ত হিম হয়ে আছে জগৎ। শুয়ে-শুয়ে অমল বাইরের অবস্থাটা অনুমান করে নিল, এবং সারা শরীর কুঁকড়ে শুয়ে থাকল।

এ-সময় আবার নতুন করে অমল গান শুনতে পেল। হিমানীমাসি গাইছেন : 'প্রেমের রাজা জনম নিল বেথেল গোশালাতে...।' অদ্ভুত শোনাল গানটা। হিমানীমাসির ভাঙা বেখাপ্পা গলায় এই গান একেবারে কীর্তন-কীর্তন লাগছিল। হিমানীমাসির সঙ্গে কে অর্গান বাজাচ্ছে কে জানে! কৃষ্ণা না ভ্রমর!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অমল হঠাৎ যীশুর জন্মের ছবিটি কল্পনা করল। বেথেলহেমের গোশালায় যীশু জন্মেছেন, মেষপালকরা ভিড় করে দেখতে এসেছে। যবপাত্রে কাপড় জড়ানো ছোট যীশু। মেরীর কোলে সন্তান যীশু। মেরীর মাথার পাশে সূর্যের মতন আভা। অমল বস্তুত কল্পনায় যে-ছবিটি দেখল, ভ্রমর কাল সেই ছবি তাকে বই থেকে দেখিয়েছিল। ছবির সঙ্গে তার কল্পনার কোনো প্রভেদ ঘটল না, কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে অনুভব করল, ভ্রমরও যেন মেষপালকদের সঙ্গে মিশে যীশুকে দেখতে গেছে।

হিমানীমাসির গানের সঙ্গে এবার মেসোমশাই এবং ভ্রমররাও যোগ দিয়েছে। কান পেতে আরও একটু শুনল অমল, তারপর উঠে বসল। মনে হল, আর ঘুমোনো উচিত নয়। এ-বাড়িতে সকলেই যখন এই শীতের ভোরে উঠে যীশু বন্দনা করছে তখন সে জেগে উঠে চুপচাপ শুয়ে কি করবে। বরং উঠে জামা-কাপড় পরে মুখ ধুয়ে বসার ঘরে গিয়ে বসাই ভাল।

কাল রাত্রে বেশী রকম খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। মেসোমশাই কলেজের চার-পাঁচজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। যোশী, মুলচাঁদ এঁরাও ছিলেন। বাঙালী প্রফেসার তিনজন; তিনজনেরই নেমন্তন্ন ছিল। একজন এসেছিলেন একেবারে পাকা সাহেব, কম বয়সের একজন। ইংরিজী পড়ান। একটু মাতাল-মাতাল লাগছিল তাঁকে। হোহো করে হাসছিলেন, কোনো কাজে ভ্রমর কাছে গেলে ডাকছিলেন। অমলের খুব খারাপ লাগছিল তাঁকে। ভ্রমর পরে বলেছে, ওঁর নাম মিহিরকুমার সান্যাল। নতুন এসেছেন। একা থাকেন, বাড়ি ভাড়া নিয়ে।

অমল বিছানা থেকে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে গিয়ে তার ট্রাউজার, জামা, সোয়েটার, মোজা এক ছুটে নিয়ে এসে বিছানার ওপর ফেলল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়ে বসে কিছুক্ষণ হিহি করে কাঁপল। আরে ব্বাস, কী ঠাণ্ডা! বরফ পড়ছে যেন বাইরে। এই ঠাণ্ডায় ভ্রমররা কখন উঠেছে, কখন পোশাক বদলেছে, কখনই বা যীশুর গান গাইতে বসেছে কে জানে! ওদের কি শীত করছে না?

অমল ভেবে দেখল, সরস্বতী পুজোর দিন, মাঘ মাসের ভোরে তারা যখন দল মিলে সারা রাত এবং ভোরে ঠাকুর সাজিয়েছে তখন তারা শীত অনুভব করতে পারত না; ওই রকম ভোর রাতে একবার অমলকে স্নান করতে হয়ে-

ছিল ঠাকুরের ফলফুল গোছানোর জন্যে। আসলে এসব সময় শীত করে না, মন এত খুশী থাকে যে শীত গায়ে লাগে না। ভ্রমরদেরও শীত লাগছে না নিশ্চয়।

দেখতে-দেখতে ভোর ফুটে উঠেছিল। ঘরের অন্ধকার যেন আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এসে হালকা ধোঁয়ার মতন ভাসছে। দরজা জানলা দেখা যাচ্ছিল চোখে। অমল বিছানার মধ্যে বসে পায়ের মোজাটা আগে পরে নিল। তারপর সোয়েটার গায়ে চড়াল। কাল মাঝরাতের দিকে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তখন তার হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু অমল কথাটা বিশ্বাস করে নি এবং ঘুম জড়িয়ে থাকায় সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কথাটা এখন আবার অমলের মনে পড়ল। ভ্রমর বলেছিল, "সকালে উঠে তোমার ঘরে একটা জিনিস দেখতে পাবে। কাউকে বলবে না, চুপচাপ থাকবে।"

এখন ত সকাল হয়ে আসছে, কই কিছু দেখতে পাচ্ছে না অমল। ট্রাউজার পরতে-পরতে অমল চোখের দৃষ্টি যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ম করে চারপাশ তাকাল। আলো ভালো করে না ফুটলে স্পষ্ট কিছু দেখা যাবে না অবশ্য। কিন্তু ভ্রমর কি জিনিসের কথা বলেছে অমল বুঝতে পারল না।...তার অনুমান, ভ্রমর তাকে কোনো উপহার দেবে। উপহারই হওয়া সম্ভব। মেশোমশাই অমলকে বড়দিনে খুব সুন্দর একটা উপহার দিয়েছেন, ফাউন্টেনপেন; মাসিমা দিয়েছেন একবাক্স রুমাল। কৃষ্ণা তাকে খুব চমৎকার একটা চামড়ার বাঁধানো নোট-বই কিনে দিয়েছে। এ সব উপহার আজ আর-একটু বেলায়, কিংবা দুপুরে অমল হাতে হাতে পাবে। ওরা সবাই যে যা কিনেছে অমলের জন্যে, অমল দেখেছে। ভ্রমর কিছু বলে নি, কিছু দেখায় নি। লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা চমকে দেবার মতন কাণ্ড করেছে আর কি!

অমল হাসল মনে-মনে, হেসে ঘরের চারপাশে আবার তাকাল। তাড়াতাড়ি কেন এই ঝাপসা অন্ধকার ফরসা হয়ে আসছে না ভেবে সে অধৈর্য হল।

একটা কাজ খুব বোকার মতন হয়ে গেছে অমলের। জুতো জোড়া খুঁজে পায়ে গলিয়ে নিতে নিতে অমল ভাবল, সে বোকার মতন এক কাণ্ড করেছে। ভ্রমর এবং কৃষ্ণার জন্যে তার কিছু কেনা উচিত ছিল। পরশু দিন সন্ধেবেলা বাজারে গিয়ে ওরা সবাই যখন কেনাকাটা করছিল তখন অমলের উচিত ছিল কিছু কেনা। সে কেনে নি। তার কাছে টাকাও ছিল না। বাড়ীতে তার কাছে যা টাকা আছে তাতে ভাল জিনিস কিছু কেনাও যাবে না। অমল ভেবে দেখেছে, তার টাকা দিয়ে সে যদি একটু দামী জিনিস কেনে তবে বাড়ি ফেরার সময় বাবাকে চিঠি লিখে কিছু টাকা আনাতে হবে। লিখলে বাবা টাকা পাঠাবেন। গতকাল অমল মনে-মনে বাবাকে চিঠি লেখাই স্থির করে ফেলেছিল, কিন্তু চিঠি লেখার সময় পায় নি, ভ্রমরদের সঙ্গে বাড়ি সাজিয়েছে সমানে। আজ সে আর-একবার তার টাকার হিসাবপত্র করে নেবে, করে বাবাকে চিঠি লিখবে। অমলের ইচ্ছে, আজ বেলায় কিংবা দুপুরের দিকে চকবাজারে গিয়ে ভ্রমরদের জন্যে সে উপহার কিনে আনবে।

অমল এগিয়ে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। বাইরে খুব ঠান্ডা, তবু আজ এই ভোরে অমল জানলাগুলো খুলে দেবে। জানলা খুলতে-খুলতে অমল মেসোমশাই মাসিমার কথা ভাবল। ভ্রমর কৃষ্ণা বাবা-মা'র কাছ থেকে

শাড়ি জামা-টামা উপহার পেয়েছে, অমলরা যেমন দুর্গাপুজোর সময় পায়। ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। অমল ভেবে পেল না, সে কি ধরনের জিনিস কিনবে ভ্রমরদের জন্যে! ভ্রমরকে সে কি দিতে পারে?

জানলা খুলে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ভোর ঘরে পা বাড়িয়ে দিল। সূর্য ওঠে নি। সামনে পুঞ্জীভূত নিবিড় কুয়াশা সাদা ধোঁয়ার মতন; প্রত্যূষের কনকনে বাতাস; গাছপালা ভিজে-ভিজে দেখাচ্ছিল, পাখিদের গলা শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডার স্পর্শে অমল দাঁতে দাঁত চেপে থরথর করে কাঁপল।

বাইরের প্রখর বাতাস এবং আর্দ্র কুয়াশা এসে অমলের নাক মুখ এত ঠাণ্ডা করল যে তার চোখে নাকে জল এসে গেল। জানলার কাছ থেকে সরে এল অমল; অন্য জানলাটাও খুলে দিল। দিয়ে বাইরের চেহারাটা আর একবার দেখল। সকালটা খুব শুভ্র এবং সতেজ দেখাচ্ছিল, কিন্তু রোদ না ওঠায় উজ্জ্বল ও মনোরম লাগছিল না। মাঠ ঘাস গাছপালা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে হয়ে যাওয়ার পর যেমন দেখায় সেই রকম ভিজে দেখাচ্ছিল।

ঘরে ফরসা ভাব এসে পড়ায় অমল এবার চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল, এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়াল পর্যন্ত হেঁটে গেল, নীচু হয়ে-হয়ে লক্ষ করল, কিন্তু ভ্রমরের কথামতন কিছু খুঁজে পেল না। ভ্রমর কি তাহলে ভুলে গেছে রেখে দিতে? অমলের সে-রকম মনে হল না। ভ্রমর এ-ব্যাপারে ঠাট্টা করবে তার সঙ্গে এ-রকম হতে পারে না। অমলের খারাপ লাগছিল। সে দুঃখিত এবং বিমর্ষ বোধ করল। ভ্রমরের রেখে যাওয়া জিনিসটা পাবে এই প্রত্যাশা এবং লোভে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে; বরং অমলের এখন মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ যেন ইচ্ছে করে সে নিশ্চিত কিছু প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করে-করে কোনো সুখ সইছিল।

কাল রাত্রে অনেকবারই ভ্রমর এ-ঘরে এসেছে। অমল শুয়ে পড়ার আগেও একবার এসেছিল। ভেতর দিকে জানলা সারা রাত খোলা পড়ে আছে। ভ্রমর যা দিতে চেয়েছিল অনায়াসে দিতে পারত। সে কেন দিল না, কি অসুবিধে তার হল কে জানে!

ভোরবেলায় অমলের মন ভেঙে গেল, অভিমান এবং দুঃখ হল। একপাশ থেকে মাফলারটা উঠিয়ে নিয়ে অমল আরও একবার ঘর দেখল দেখে দরজার ছিটকিনি খুলে বাথরুমে চলে গেল।

সূর্য উঠল যখন তখন বাড়িতে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। আজ সকালে গির্জায় ক্রীশমাসের বিশেষ প্রার্থনা। হিমানীরা সবাই চার্চে চলেছেন। সাজ-গোজ এখনও শেষ হয় নি সকলের। কৃষ্ণা যেন সারা বাড়ি ছুটোছুটি করছিল, তার গলা শোনা যাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে, ভ্রমর ঘর বন্ধ করে পোশাক বদলাচ্ছে, মেসোমশাই বাদামী রঙের একটি স্যুট পরে বাইরে ফুলবাগানে রোদে দাঁড়িয়ে পাখিদের কেক-বিস্কুটের গুঁড়ো খাওয়াচ্ছেন, ফলের টুকরো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছেন। হিমানীমাসি এখনও ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন নি।

অমল চা খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মেসোমশাই মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সকালটি এখন রোদ আলো ও সর্বরকম উজ্জ্বলতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। আকাশে কোথাও একটু মলিন ভাব নেই, ছিমছাম পরিষ্কার আকাশ, আগুনের নরম আঁচের মতন রঙ ধরছে রোদের, গাছপালার

সবুজ পাতাগুলি খুব ঝকঝকে দেখাচ্ছে, মরসুমী ফুলের বাগানের সব ফুলই প্রায় তুলে নেওয়া, দু-একটি সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প পাতার মধ্যে ফাঁকে-ফাঁকে দেখাচ্ছিল। গোলাপ গাছে মাত্র একটি লাল গোলাপ। ঘাসের ওপর সকালের রোদ সোনার জলের মতন ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মেসোমশাইয়ের চারপাশে পাখির ঝাঁক, কতক চড়ুই কতক শালিক, কাক এসেছে দল বেঁধে। ওর মধ্যে অমল একটি বেগুনী-লাল পালকের ছোট্ট পাখি দেখল। সে আলাদা একপাশে দাঁড়িয়ে ভীরুর মতন বিক্ষিপ্ত খাদ্যকণা খুঁটে নিচ্ছিল।

বাড়ির ফটকের কাছে টাঙা এসে গেল। মেসোমশাই টাঙা দেখে ব্যস্ত হলেন, হাতের ঘড়ি দেখলেন। পাখিদের খাবার দেওয়া বন্ধ হল; রুমাল বের করে হাত মুছলেন। মুছে অমলকে একবার তাগাদা দিতে পাঠালেন।

কৃষ্ণা সাজগোজ শেষ করে ফেলেছে। খুবই অবাক হয়ে অমল দেখল, কৃষ্ণা আজ শাড়ি পরেছে। নীল রঙের জংলী ছিট-ছিট সিল্কের শাড়িতে কৃষ্ণাকে একেবারে নতুন ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। শাড়িটা যেন সে দু-হাত দিয়ে বয়ে-বয়ে হাঁটছে। গায়ে সাদা ফ্লানেলের মেয়েলী কোট, কোটের বুকে নানা রকম কারুকার্য। মাথায় খোঁপা বেঁধেছে। কানে ইয়ারিং, হাতে বালা। অমল মুগ্ধ হয়ে বলল, "বারে! তোমায় একেবারে...একেবারে বিরাট বড় দেখাচ্ছে!"

রুমাল দিয়ে কৃষ্ণা কপালের পাউডার মুছছিল। সারা মুখ খুশীতে উথলে উঠল। বলল, "ভাল দেখাচ্ছে?"

"খুব ভাল। বিউটিফুল!"

"হ্যাত্!"

"বলছি। তুমি আর কাউকে গিয়ে দেখাও।"

"টিকলি পরবো একটা?"

"টিকলি! টিকলি কি?"

"টিপ, এক কিসমের টিপ; আমার কাছে আছে।"

"হিন্দুস্থানী টিপ!" অমল হা-হা করে উঠল, "পরো না। মার্ডার হয়ে যাবে সব। এমনিতেই বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।" বলে অমল স্নেহবশে কৃষ্ণার মাথার ওপর থেকে সুতোর একটা আঁশ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। বলল, "মেসো-মশাই ডাকাডাকি করছেন—তাড়াতাড়ি নাও।"

কৃষ্ণার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রমরকে ডাকতে গেল অমল। ভ্রমরের ঘরের সামনেই দেখা। দরজা খুলে সবে বেরিয়েছে। অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, অপলক চোখে দেখতে লাগল ভ্রমরকে।

ভ্রমর দুধের মত সাদা একটি শাড়ি পরেছে; সিল্ক নয়, অথচ সিল্কের মতন নরম মসৃণ ও ঝকঝকে, শাড়ির পাড় নেই, কমলা রঙের সুতো দিয়ে ধার মোড়া আগাগোড়া; গায়ে সাদা জামা; বাদামী রঙের সামান্য কাজ করা শাল গায়ে, চুল এলো, ঘাড়ের কাছে ফিতের একটা ফাঁস দেওয়া রয়েছে। মুখে কোথাও কোনো প্রসাধন নেই, হয়ত সামান্য পাউডার ছোঁয়ানো। ভ্রমরের হাতে ছোট বাইবেল। অমল অভিভূত হল। তার মনে হচ্ছিল, ভ্রমরের সমস্ত চেহারায় কেমন যেন অতি পবিত্র একটি আভা ফুটে রয়েছে, আশ্চর্য শুভ্রতা এবং শুদ্ধতা। মুহূর্তের জন্যে অমলের মনে হল, ভ্রমরকে এখন ঠিক যেন একটি ছবির মতন দেখাচ্ছে। তার গায়ে সকালের আলো, পায়ের তলায় রোদ।

অভিভূত অমল কেমন শব্দ করল একটু, বিমোহিত মানুষ যেমন করে। পরক্ষণেই তার মনে হল, সকাল থেকে সে ভ্রমরের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। ভ্রমর তাকে অকারণে প্রতীক্ষা করিয়েছে, সারা ঘর খুঁজিয়েছে অথচ অমল পায় নি।

ভ্রমরই কথা বলল প্রথমে, "তুমি পোশাক বদলাও নি?"

"আমি!...না।"

"তুমি যে কাল বলেছিলে আমাদের সঙ্গে যাবে।"

অমল বলেছিল; তার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে সে ভেবে দেখল, তার যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আজ চার্চের অন্য চেহারা। ইংলিশ চার্চে এবং আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে গিয়ে সে মুশকিলে পড়ে যাবে। কিছু বুঝবে না, অন্যদের মতন যা-যা করার করতে পারবে না, অত লোকের মধ্যে বোকার মতন, গেঁয়োর মতন মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অমল যত এই সব কথা ভেবেছে, তত অস্বস্তি বোধ করেছে কুণ্ঠা অনুভব করেছে। তা ছাড়া, অমল আরও ভেবে দেখেছে, সে যখন কৃশ্চান নয় তখন ভ্রমরদের আজকের পবিত্র উপাসনায় যোগ দেওয়া তার উচিত হবে না। উপাসনা জিনিসটা ঠাট্টা তামাশা নয়, ম্যাজিক কিংবা সার্কাস নয় যে অমল কৌতূহল-বশে দেখতে যাবে! মন খুঁতখুঁত করছিল অমলের। সে শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছিল, সে যাবে না।

অমল এখন কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল ভ্রমরের কথায়। ইতস্তত করে বলল, "আমি আজ যাব না।..." বলে একটু থেমে আবার বলল, "আজ আমার গির্জায় যাওয়া ভাল দেখায় না।"

ভ্রমর বেশ অবাক হল যেন। বলল "ভাল দেখাবে না কেন?"

"না, দেখাবে না।...আমি পরে তোমায় বুঝিয়ে বলব!" তাড়াতাড়ি অমল বলল। বলে হাসির মুখ করল সুন্দর করে। "তোমায় খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। কেমন সন্ন্যাসিনী-টন্ন্যাসিনী। পবিত্র-পবিত্র লাগছে।"

ভ্রমরের চোখে শান্ত মধুর একটু হাসি নামল, মুখের ভাব সেই রকম নরম ও আনন্দময়। ভ্রমর বলল, "আমি একদিন সন্ন্যাসিনী হব ভাবতাম কি না, তাই!"

অমল কান করে শুনতে চায়নি, তবু ভ্রমরের কথাটা তার কানে বাজল। চোখ চঞ্চল হল অমলের। "সন্ন্যাসিনী হবে ভাবতে!"

"ভাবতাম—।" ভ্রমর যাবার জন্যে পা বাড়াল, এক মুঠো রোদ তার গালে পড়ল তখন। পা বাড়িয়ে ভ্রমর বলল, "তুমি তবে একলা একলা থাক বাড়িতে, আমাদের ফিরতে বেলা হবে।"

অমলও ভ্রমরের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। "আমি এখন বেরুবো।"

"কোথায়?"

"বেড়াতে। বাজারের দিকে যাব একবার।" অমল কেন বাজারের দিকে যাবে তা গোপন করে রাখল।

দু-পা এগিয়ে অমল হঠাৎ বলল, "ভ্রমর, তুমি আজ আমায় খুব ঠকিয়েছ।"

যেতে-যেতে ভ্রমর দাঁড়াল; দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে অমলকে দেখল। অবাক হয়েছিল ভ্রমর। তার চোখের দৃষ্টি বলছিল, ঠকালাম! কি ঠকালাম!'

অমল বলল, "আমি সকালে উঠে ঘরে কিছু পাই নি।"
"পাও নি?" ভ্রমরের চোখের পাতা বড় হয়ে এল।
"না, কিচ্ছু না। সমস্ত ঘর খুঁজেছি।"
ভ্রমর অমলের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল দু-মুহূর্ত। "ঘরে খুঁজেছো!"
"ঘরেই ত বলেছিলে!"
"তাহলে ঘরেই আছে।" ভ্রমর এবার যেন সব বুঝে ফেলে সকৌতুক মুখে হাসল, হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।
ও-পাশ থেকে কৃষ্ণা ডাকাডাকি করছে, হিমানীমাসির গলাও পাওয়া গেল। ভ্রমর চলে যাচ্ছিল।
অমল বলল, "ঘরে কিছু নেই। কিচ্ছু না।"
"চোখ থাকলে ঠিক খুঁজে পাবে।" ভ্রমর মুখ ফিরিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে খুব মিষ্টি করে বলল। বলে চলে গেল।
অমল রীতিমত বোকা হয়ে থাকল।

সারাটা দিন আনন্দে কাটল। গীর্জা থেকে ভ্রমরদের ফিরতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। ওরা যখন ফিরল, ওদের সঙ্গে বিচিত্র সব অতিথি। মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা। সবাই অবাঙালী। মেয়ে-পুরুষরা বসার ঘরে বসল, চা কেক খেল, হোহো করে হাসল, গল্পগুজব করল; আর বাচ্চাগুলো বাইরে মাঠে ছুটো-ছুটি করে খেলা করল, দোলনায় দুলল। ওরই মধ্যে কৃষ্ণা শাড়ি বদলে তার এক সমবয়সীর সঙ্গে খানিকটা ব্যাডমিণ্টন খেলে নিল। কাল মেসোমশাই ঝুড়ি সাজিয়ে কোথায় যেন ডালি পাঠিয়েছিলেন, আজ দু-দফা এ-বাড়িতে ডালি এল। অমল অবাক হয়ে দেখল, একটা ঝুড়িতে এক বোতল মদ এসেছে। হিমানীমাসি নিজের হাতে সেটা সরিয়ে রাখলেন।
হু-হু করে দুপুর এসে গেল, দেখতে-দেখতে দুপুরও ফুরিয়ে গেল। দুপুর থেকেই বাড়ি আবার ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, সামান্য যেন ক্লান্তি নেমেছে এ-বাড়িতে। আজ দিনটাও সেই রকম শুকনো, কনকনে প্রবল শীত যত, তত তপ্ত অনাবিল রোদ আর আলো; যত ঝোড়ো বাতাস, তত যেন দেবদারুপাতার সুগন্ধ। দুপুরবেলায় অমল আজ ঘুমিয়ে পড়েছিল।
বিকেলে আবার বাড়ি জেগে উঠল। মেসোমশাই, মাসিমা যাবেন এক নিমন্ত্রণে; কৃষ্ণা যাচ্ছে তার বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে করে কোথায় যেন সার্কাস দেখতে। ফিরতে বেশ রাত হবে, বেশী রাত হয়ে গেলে ওরা ফিরবে না, লীলাদের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যাবে।
কৃষ্ণা বিকেলের গোড়াতেই চলে গেল; হিমানীরা বেরোলেন সন্ধের দিকে। টিসরিকেও আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে বিকেলে। কাজকর্ম সেরে সে বেরিয়ে গেছে, ফিরবে সন্ধের পর।
কাল থেকে ক্রমাগত যে-রকম পরিশ্রম, হই-হই চলছিল, তাতে ভ্রমর বেশ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। অবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে উঠল যখন, তখন বিকেল ফুরিয়ে গেছে, কৃষ্ণা বাড়ি নেই। কিছু খুচরো কাজ ছিল, ভ্রমর আর গা পেল না, বাঁ পায়ে কেমন যেন ব্যথা হয়েছে, টান ধরে আছে।

টুকটাক এটা-ওটা সেরে ভ্রমর বাথরুমে গেল। কলঘর থেকে ফিরে বিকেলের পোশাক বদলাতে সন্ধে হয়ে এল। হিমানীরা আর একটু পরেই নিমন্ত্রণে চলে গেলেন।

সমস্ত বাড়ি ফাঁকা, নিস্তব্ধ। উৎসবটা যেন হঠাৎ এসেছিল এ-বাড়িতে, হঠাৎই চলে গেল, সারা বাড়ি নিরিবিলি নীরব শান্ত রেখে গেল। বসার ঘরটি সেই রকম সাজানো থাকল, বারান্দায় দেবদারুপাতা এবং লাল নীল কাগজের ফুল বাতাসে ছিঁড়ে যেতে লাগল। তবু বারান্দায় একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বালানো থাকল, ভাড়া-করা পেট্রম্যাক্স।

হিমানীরা চলে যেতেই অমল নিজের হাতে মালসায় আগুন রেখে ভ্রমরের ঘরে দিল, নিজেই চা করল। মাথা খাটিয়ে গরম জল করে হট্ ওয়াটার ব্যাগে ভরল, ভরে ভ্রমরের পায়ের তলায় দিল, বলল, "পায়ে টান ধরেছে, শিরার টান, গরম দাও সেরে যাবে।"

সামান্য সময় আর পাঁচটা কথা বলে অমল যেন একটা ভূমিকা লুকিয়ে-লুকিয়ে সেরে নিল, তারপর বলল, "আচ্ছা ভ্রমর, তুমি সবচেয়ে কি বেশী ভালবাস?"

ভ্রমর বুঝল না। না বুঝে সরল অবাক চোখ তুলে চেয়ে থাকল।

অমল অপেক্ষা করল সামান্য, পকেটে হাত ঢোকাল আড়াল করে। বলল, "বাইবেল বাদ দিয়ে বলছি। কি ভালবাস বেশী?"

"কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি।...জিজ্ঞেস করতে নেই?"

"আমি সব ভালবাসি।" ভ্রমর হেসে বলল।

"সব কেউ ভালবাসতে পারে না।" অমল অতি নিশ্চিন্ত গলায় বলল, বলে পকেট থেকে আস্তে-আস্তে হাতের মুঠো বের করছিল।

ভ্রমর বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছিল অমল বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু একটা ঢাকবার চেষ্টা করছে। অমলকে লক্ষ করল ভ্রমর ভালো করে; বলল, "তোমার ফন্দি আছে।"

"কিচ্ছু না।" অমল মাথা নাড়ল খুব জোরে-জোরে।

"তবে?"

"তোমার চেয়ে ভাল ফন্দি কারও নেই। কী মাথা একটা!..আমায় বোকা বুদ্ধু করে দিয়েছ?"

ভ্রমর এবার ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। ডালিমের দানার মতন দাঁত দেখা গেল। চোখ দুটি হাসিতে থইথই করছিল। যেন কিছু জানে না, এইরকম ভাব করে, ঠোঁটের কাছে আঙুল এনে ভ্রমর বলল, "তোমার ঘরেই সেই জিনিসটা ছিল তবে—!"

"বালিশের তলায়—"

ভ্রমর ঠোঁটের আঙুল তাড়াতাড়ি জোড়া-ওষ্ঠের ওপর রাখল। বলল, "আর বলবে না কিছু। বলেছি না, চুপচুপ থাকবে; কাউকে কিছু বলবে না।"

অমল গ্রাহ্য করল না। ভ্রমরের দিকে হেলে শুয়ে পড়ল যেন বিছানায়। বলল, "তোমার ছবি ছিল আমি জানতামই না। নয়ত কবেই স্টিলিং করতাম।"

"কি করতে?"

"চুরি। স্টীলিং বোঝো না! সেই মেয়েটা যা করেছে—" বলে অমল খুব সন্তর্পণে তার পকেট থেকে হাত বের করে সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে ভ্রমরের কোলের কাছে হাত বাড়াল। "ছবিটা, বুঝলে ভ্রমর, খুব বিউটিফুল। তোমায় যা সুন্দর দেখাচ্ছে। কবে তুলেছ?"

"গত বছর ক্রীশমাসে।"

"ক্রীশমাসে?" অমল একমুহূর্ত কি ভাবল, বলল, "তবে তুমি জানতে এ-বছর ক্রীশমাসে আমি আসব।" বলে অমল আশ্চর্য সুন্দর মুখ করে হাসল।

ভ্রমর জানত না অমল আসবে। গত বছর যখন তারা ছবি তোলায় ক্রীশ-মাসে, তখন মেঘলা-মেঘলা দিন, রোদ আলো দেখা যাচ্ছিল না তেমন, চারপাশ মনমরা হয়ে ছিল, বিষণ্ণ; এবারে এত রোদ এত আলো। এত হাসিখুশী হয়ে ক্রীশমাস আসবে, কে জানত! হয়ত ভ্রমরের সমস্ত জীবনে এই প্রথম এক ক্রীশমাস এল, যার সুখ সে আর কখনও অনুভব করে নি।

অস্ফুট গলায় ভ্রমর কেমন আচ্ছন্নের মতন বলল, "ভগবান জানতেন।"

ঠিক এই সময় অমল ভ্রমরের কোলের ওপর তার মুঠো খুলে একটা কি যেন ফেলে দিল। দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বলল, "আরে ব্বাবা, তোমার আজ খুব ভাল দিন। গায়ে প্রজাপতি বসছে।"

ভ্রমর অমলের চোখ দেখল, দেখে নিজের কোলের ওপর চোখ নামাল। তার কোলে ছোট্ট একটি প্রজাপতি, সোনার যেন। ভ্রমর কয়েক পলকের মতন বিহ্বল হয়ে থাকল। সে বুঝতে পারে নি প্রথমে, তারপর বুঝতে পারল। আস্তে করে ডানহাত বাড়িয়ে সেই প্রজাপতি তুলে নিল। রুপোর পাখনায় সোনার জল ধরানো, মিনের সুন্দর কাজ, প্রজাপতির চোখ দুটিতে সবুজ দুটি পাথরের কণা। ভ্রমরের মনে হল, সত্যিই যেন এক ছোট্ট প্রজাপতি তার হাতের মুঠোয় এসে বসেছে।

অমল ভ্রমরের মুখ দেখছিল। ভ্রমরের বিস্ময় খুশী এবং আনন্দ অনুভব করবার জন্যে সে নিষ্পলক নয়নে মুহূর্ত গুনছিল।

ভ্রমর চোখ ওঠাল, অমলের চোখে-চোখে তাকাল। যেন ভাবল একটু কি বলবে। হঠাৎ তার কি মনে পড়ে যাওয়ায় মুখে চাপা হাসি নামল; বলল, "খুব বিউটিফুল।" অবিকল অমলের বলার ভঙ্গি নকল করে, অমলের মুদ্রা-দোষটির মতন করেই বলল ভ্রমর। তারপর দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

অমল বলল, "তোমাদের এখানে কিছু পাওয়া যায় না। সব রদ্দি জিনিস। ওই ব্রোচ কিনতে আমায় যা ভুগতে হয়েছে..."

অমলকে কথা শেষ করতে দিল না ভ্রমর, বলল, 'অনেক দাম নিয়েছে।"

"ভাল জিনিস হলেই বেশী দাম।" অমল অভিজ্ঞের মতন বলল।

"বেশী দাম দিয়ে তুমি কিনলে কেন? তুমি কি চাকরি করো?"

ভ্রমরের গলায় বোধ হয় অমলের অবিবেচনার জন্যে সামান্য ভর্ৎসনা ছিল। অমল গ্রাহ্য করল না। বলল, "মেয়েদের নেচার খালি দামটাম দেখা! আমরা ও-সব কেয়ার করি না। যা ভাল দেখব নিয়ে নেব।" বলে অমল এবার বিছানার ওপর গড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সিলিঙের দিকে চোখ রাখল কয়েক পলক, বলল, "আমি একটা ভোমরা খুঁজলাম কত! বলল—হয় না। হ্যাত, জানে না কিছু...। প্রজাপতি ব্রোচ হলে ভোমরা হবে না কেন?—যদি একটা ভ্রমর পেয়ে যেতাম,

বুঝলে স্যার, তবে...’

“পেলে না?” ভ্রমর এবার সকৌতুক করে বলল।

“না। এখানে বিউটিফুল কিছু পাওয়া যায় না।”

এবার ভ্রমর ‘ইস্’—মতন শব্দ করলে জিবে। শব্দ শুনে অমল মাথা ফেরাল, ভ্রমরের দিকে তাকাল। ভ্রমরের মুখে বিচিত্র ও মনোহর হাসি, অথচ হাসির তলায় যেন লুকোনো একটা কৃত্রিম অভিমান রয়েছে। ভুরু দুটি ঈষৎ বাঁকা, ঠোঁটের ডগাও সামান্য বঙ্কিম। অমল মুগ্ধ হয়ে সেই মুখ দেখছিল। দেখতে-দেখতে সে অনুভব করল ভ্রমর তাকে ঠাট্টা করছে। কিসের ঠাট্টা অমল তাও ধরতে পারল।

এবার অমল খুব বিচক্ষণের মতন যেন তার ভ্রম সংশোধন করে নিয়ে বলল, “আমার একটু ভুল হয়েছে, এখানে একটা শুধু বিউটিফুল ভ্রমর পাওয়া যায়।” বলে কথাটা যেন ভ্রমরকে বুঝতে সময় দিল এক মুহূর্ত, তারপর জোরে হেসে উঠল।

ভ্রমর যদিও ওই কথাটি মনে-মনে শুনতে চাইছিল, তবু এখন সে লজ্জা পেল। লজ্জা তার মুখের সৌন্দর্য আরও কমনীয় করে তুলেছিল। চোখের পাতা নামিয়ে নিল ভ্রমর, যেন চোখ বুজে ফেলল।

অল্প সময় চুপচাপ কাটল। ভ্রমর একই ভাবে বসে থাকল, অমল অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবল। নিঃশব্দ অবস্থাটি ক্রমে ঘন হয়ে এসে দুজনের চেতনায় কেমন উদাসীনতার বোধ জাগাল। কেন, কেউ বুঝল না। অমল নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে, ভ্রমর তার মুঠোর প্রজাপতিটি বালিশের পাশে রাখল।

অমল মনের বিষণ্ণ ভাবটি আর যেন সহ্য করতে পারল না, সামান্য নড়েচড়ে হঠাৎ গুন-গুন করে গান গাইল, তারপর উঠে বসল। কোটের বুক-পকেটে একটা সিগারেট রেখেছিল অমল। সিগারেটটা চেপটে গেছে। আঙুলের ডগা দিয়ে সিগারেট গোল করতে-করতে অমল উঠল।

“ভ্রমর—!” অমল উবু হয়ে বসে সিগারেট ধরাচ্ছিল মালসার আগুনে।

“উঁ—”

“আজ সকালে তোমাদের গান শুনে ঘুম ভেঙেছে।” সিগারেট ধরানো হয়ে গিয়েছিল বলে অমল একমুখ ধোঁয়া টেনে নিল। কিছুটা গলায় গেল, কিছুটা ঘরের বাতাসে মিশল। ফাঁকা হলে অমল ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, “আমি বলি এবার তুমি একটা ক্লোজিং সঙ্ গাও।” কথাটা হালকা এবং লঘু করেই বলল অমল।

ভ্রমর জবাব দিল না। অমল অপেক্ষা করল। মালসার আগুন যেন আজ তেমন করে জ্বলছে না। ছাই হয়ে আসছে।

সহসা ভ্রমর খুব মৃদু, মিহি এবং নিবিড় গলায় গান গাইতে শুরু করল। অমল উঠল না। মেঝের ওপর বসে গান শুনতে লাগল। ‘হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না...’

গানের মধ্যে অমল ভাবল, ভ্রমর তাকে সত্যি-সত্যি শেষ-গান শোনাচ্ছে।

গান শেষ হলে অমল বলল, “বাঃ; ওআন্ডারফুল! আমি এ-গান আগে শুনেছি।” বলে অমল কি ভেবে হঠাৎ হেসে বলল, “আচ্ছা ভ্রমর, এই

'সখা'-টা কে?"

ভ্রমর যেন আশা করে নি এ-রকম প্রশ্ন। ইতস্তত করল। বলল, "কেন, ভগবান।"

"ভগবান!"...অমল কেমন থতমত খেয়ে গেল, তারপর কেমন অদ্ভুত গলায় বলল, "আমি ভেবেছিলাম, আমি।"

"তুমিও!" ভ্রমর বলল।

১০

দূরে বৃষ্টি নামলে যেমন সব সাদা ঝাপসা দেখায়, সকালের কুয়াশা সেই রকম ধোঁয়াটে ঘন ভিজে আবরণ ছড়িয়ে অনেকক্ষণ শূন্যের সমস্ত স্বচ্ছতা ঢেকে রেখেছিল। রোদ উঠতে বেলা হল। আলোর রঙ প্রথমটায় মেঘলা দিনের মতন খুব ফিকে এবং নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। তারপর এক সময় শূন্যের সমস্ত আবিলতা মুছে গেল, কুয়াশার আর্দ্র কণা রৌদ্রে শুষ্ক হল, এবং অতিশয় উজ্জ্বল রোদ উঠল।

কৃষ্ণা সাইকেল নিয়ে কলাঝোপের দিকে মাঠে স্লো-সাইকেল প্র্যাক্‌টিস করছিল: ঠিক পারছিল না, পড়ে যাচ্ছিল, পা দিয়ে মাটি ধরছিল। এ-সব আর কিছু নয়, নিতান্ত যেন ভূমিকা, সামান্য পরে বাড়ি ছেড়ে লীলার কাছে পালাবে।

আনন্দমোহন ফুলবাগানে কাজ করছিলেন। হাতে মস্ত এক কাঁচি আর মাটি কোপানো ছোট্ট খুরপি। মরসুমীফুলের নরম মাটি আলগা করে হিমে-ভেজা রোদে-মরা পাতা সরিয়ে এবার তিনি গোলাপগাছগুলোতে হাত দিয়েছিলেন। ডালপালা কেটে দিচ্ছিলেন, গোড়ায় চা-পাতার সার দিচ্ছিলেন অল্প-স্বল্প। ঠোঁটের ডগায় সিগারেট পুড়ছিল।

অমল কাছাকাছি ছিল। কখনও কৃষ্ণার স্লো-সাইকেল দেখে হাসছিল, কখনও মেসোমশাইয়ের ফরমাস খাটছিল।

আজকের রোদটি সময় পেরিয়ে এসেছে বলেই যেন তার কুণ্ঠা ছিল, খুব দ্রুত তপ্ত ও ঘন হয়ে আসছিল। দেখতে-দেখতে মাঠ ঘাস ফুলপাতার ওপর রোদের পাতলা পালিশ ঘন হয়ে এসে যেন রোদ্দুরের একটি সর পড়ে যাওয়ার মতন হয়েছে। নরম তাতের আমেজ লাগছিল গায়ে। বাতাস তেমন চঞ্চল ছিল না। সোনাঝুরি গাছের মতন সেই গাছগুলি থেকে আলতারঙের ফল ফেটে সুতোর মতন আঁশ বাতাসে উড়ে-উড়ে আসছিল, শীতের মরাপাতা ঝরছিল কখনো বা। পাখিগুলি বাগানে নিত্যকার মতন আসা-যাওয়া করছে। সাদা পুচ্ছ, কালো পাখা, লাল ঠোঁটঅলা একটি পাখি এসেছিল একবার, উড়ে চলে গেছে আবার।

আনন্দমোহন গোলাপবাগান থেকে ছাঁটা ডালগুলি তুলে জড় করে অমলকে ফেলে দিতে বললেন। অমল যখন ডালপালা জড় করছিল, ফটকের সামনে মজুমদারডাক্তারের মোটরবাইক এসে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা ফটক খুলতে গিয়েছিল। ফটক খুলে দিয়ে সে আর ফিরল না, মজুমদারডাক্তার ভেতরে এলে আবার গেট বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকেই পালাল।

আনন্দমোহন হাতের কাঁচি খুরপি রেখে দিলেন মাটিতে, ধুলোময়লা

রুমালে মুছতে মুছতে এগিয়ে গেলেন। অমল গোলাপডালগুলো জড় করে একপাশে ফেলে দিতে গেল।

মজুমদারডাক্তারের বয়েস অনেক আগেই চল্লিশ পেরিয়েছে, গায়ে দোহারা, মুখ চৌকো মতন। চোখে চশমা। মোটামুটি ফরসা রঙ। মানুষটিকে দেখলেই মনে হয়, রোদ-জল খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ। চোখের মণি একটু কটা রঙের, ঠোঁট মোটা।

মোটরবাইক ঠেলে আসতে-আসতে মজুমদারডাক্তার বড়দিনের সুখ-শুভেচ্ছা জানালেন সহাস্য গলায়।

এগিয়ে গিয়ে আনন্দমোহন অভ্যর্থনা করলেন, "এস এস, তোমার দেখা পাওয়া ভাগ্য।" বলে আনন্দমোহন মজুমদারের কাঁধে হাত দিয়ে বাড়ির বারান্দার দিকে যেতে লাগলেন।

অমল কলাবাগানের দিকে গোলাপগাছের ছাঁটা ডালপালাগুলো ফেলে দিয়ে বারান্দার দিকে আসছিল; বুড়ো আঙুলে একটা কাঁটা ফুটে গেছে জোরে, মুখে আঙুল পুরে যন্ত্রণা সইয়ে নিচ্ছিল।

"এদিকে এসেছিলাম! মিসেস যোশী কাল সন্ধেবেলায় পড়ে গিয়ে পা মচকেছেন। একে ভারী চেহারার মানুষ, তাতে আবার সামান্যতেই অধীর হয়ে পড়েন।" মজুমদারডাক্তার মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

"হাড়টাড় ভেঙেছে নাকি?" আনন্দমোহন শুধোলেন।

"না। সে-রকম কিছু না।"

কথা বলতে-বলতে বারান্দার সিঁড়িতে উঠলেন দুজনে। অমল সামান্য পিছনে। বারান্দায় উঠে আনন্দমোহন নিজের হাতে বেতের চেয়ার টেনে আনছিলেন রোদে, অমল একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করল। মজুমদার অমলকে দেখে হাসলেন একটু, পরিচিতজনের মতন দু-একটা কথা বললেন: কি খবর, কেমন লাগছে গোছের, তারপর চেয়ার টেনে বসার উপক্রম করে বললেন আনন্দমোহনকে, "এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনাকে খবরটা দিয়ে যাই।"

আনন্দমোহন যেন জানতেন খবরটা কিসেব হতে পারে, চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, "অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছ বুঝি কিছু?"

"খুব ভাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছে, বেস্ট পসব্‌ল্‌ হেল্‌প আপনি পাবেন। ডাক্তারও বাঙালী—আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।" মজুমদারডাক্তার চেয়ারে বসলেন।

সামান্য চুপচাপ। আনন্দমোহন হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অমলকে বললেন, "অমল, তোমার মাসিমাকে বল ডাক্তারবাবু এসেছেন, চা-টা দিতে।"

অমল চায়ের কথা বলতে ঘরের দিকে চলল। এখন সে সবই অনুমান করতে পারছে, বুঝতে পারছে। ভ্রমরকে নিয়ে মেসোমশাই বাইরে যাবেন ডাক্তার দেখাতে। মজুমদারডাক্তার ব্যবস্থা করছিলেন, ভাল কোনো ব্যবস্থা হয়ে গেছে বলে জানাতে এসেছেন।

এখন অমলের মন কেন যেন একটু খারাপ হয়ে গেল। ক্রীশমাসের ছুটিতেই মেসোমশাই যাবেন কথা ছিল, কিন্তু এ কদিন এ-বাড়ি উৎসবে আনন্দে এরকম মুখর ও মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, ভ্রমরের অসুখের কথাটা যেন কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল, কেউ আর সে-কথা তুলত না, বলত না। এমন কি ভ্রমরই তার অসুখ-

বিসুখ ভুলে গিয়েছিল। অমলের খুব একটা মনে পড়ে নি, যখনই হঠাৎ মনে এসেছে, সঙ্গে-সঙ্গে অমল ভেবেছে, হয়ত ভ্রমর ভাল হয়ে আসছে, হয়ত আর বাইরে যাবার দরকার হবে না। কিংবা মনে হয়েছে, এখনও দেরি আছে।

অমল বসারঘর খাবারঘর পেরিয়ে করিডোর দিয়ে রান্নাঘরের দিকে হিমানী-মাসিকে খুঁজতে গেল।

যেতে-যেতে অমলের মনে হল, ভ্রমরের অসুখের কথাটা বাস্তবিকই তারা কেউ ভোলে নি, চাপা দিয়ে রেখেছিল। সুখের দিনে দুঃখের চিন্তা করতে কারুর ইচ্ছে হয় নি। নয়ত মেসোমশাইয়ের মতন অমল এবং ভ্রমরও মনে-মনে জানত, এই ক্রীশমাসের ছুটিতেই তাদের আলাদা হয়ে যাবার কথা; একজন যাবে ডাক্তার-ওষুধের জিম্মায়, অন্যজন আর মাত্র ক'দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবে।

ভ্রমরের ঘর দেখতে পেল অমল। দরজা খোলা। ভ্রমর ঘরে আছে কি না বোঝা গেল না। হয়ত নেই। অমল একবার ভাবল, ভ্রমরকে খুঁজে বের করে খবরটা দিয়ে আসে; পরে ভাবল, থাক, এখন থাক।

হিমানীমাসি রান্নাঘরের মধ্যেই ছিলেন, আয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অমল চায়ের কথা বলে ফিরল।

মেসোমশাইয়ের কাছে যাবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হচ্ছিল অমলের। ভ্রমর কোথায় যাবে, ক'দিন থাকবে, কবে যাবে—এসব খুঁটিনাটি জানবার জন্যে সে অধৈর্য ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিল। কৃষ্ণার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পায়ের শব্দে অমল মুখ তুলল, ভ্রমর কৃষ্ণার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। চোখে-চোখে দুজনে দুজনকে দেখল, অমল দাঁড়াল একটু, ডাক্তার আসার কথাটা বলতে গেল, অথচ শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না। কিছু না বলেই অমল বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

মেসোমশাই এবং মজুমদারডাক্তার কথা বলছিলেন, নিঃশব্দ পায়ে অমল কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকল।

"নাগপুরে আমারও এক বন্ধু রয়েছেন-" আনন্দমোহন বললেন, "এখন বোধ হয় সিনিআর প্রফেসার।"

"এখান থেকে একটু কাছেও হয়।"

"তা হয়।" আনন্দমোহন উদাস যেন। সিগারেটের ধোঁয়া টানলেন এক মুখ। "ওদের হাসপাতালটা ভালই, কি বল?"

"বেশ বড় হাসপাতাল, সব রকম ব্যবস্থা আছে।" মজুমদার বললেন, "আমি হাসপাতালের কথা বলছি এইজন্যে যে, হাসপাতালে না থাকলে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হয় না। বাড়িতে নানা রকম অসুবিধে।"

অমল কাঁটাফোটা বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে আবার জিব দিয়ে আস্তে-আস্তে ভিজিয়ে নিল। ভ্রমর তবে নাগপুরের হাসপাতালে যাচ্ছে! জব্বলপুর নয়। কেন জব্বলপুর গেল না! হাসপাতালেই বা কেন যাবে?

"কত দিন থাকতে হবে?", আনন্দমোহন জিজ্ঞেস করলেন।

মজুমদারডাক্তার সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকলেন, হয়ত হিসেব করছিলেন; বললেন, "তা ঠিক কিছু বলা যায় না। খুব শর্ট স্টে হতে পারে, আবার কিছুদিন থাকতেও হতে পারে। ওখানে গিয়ে ডাক্তার না দেখানো পর্যন্ত কিছুই জানতে পারছেন না।"

আনন্দমোহন আরও একমুখ ধোঁয়া নিলেন গলায়। আস্তে-আস্তে বুকে টানলেন। "আমার পাঁচ তারিখ পর্যন্ত ছুটি, তার মানে কাল তোমার নিউ ইয়ার্স ডে পড়ছে। পরশু যদি বেরুই, পাঁচ তারিখের মধ্যে ফিরতে পারছি না।"

"না। হাতে আরও কিছু ছুটি নিয়ে যান! অন্তত দিন পনেরোর।" বলে মজুমদার কি যেন ভেবে আবার বললেন, "কাজ শেষ হয়ে যায় চলে আসবেন, না হয় ক'দিন ওদিক থেকে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসবেন, ক্ষতি কিসের।"

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন আনন্দমোহন। অল্পক্ষণ উভয়েই নীরব থাকলেন। মনে হল আনন্দমোহন কিছু ভাবছেন। মজুমদার তাঁর চেয়ার সামান্য সরিয়ে নিলেন, রোদ লাগছিল চোখে।

"আচ্ছা ভাই—আমি একটা কথা ভাবছি", আনন্দমোহন বললেন, "মেয়েটার শরীর এখন একটু ভালই যাচ্ছে...আজকাল আর অত সিক্ মনে হয় না। তোমার হাতে আর কিছুদিন থাকলে পারত না? যদি এখানে থেকেই রিকভার করতে পারত—"কথাটা শেষ না করে আনন্দমোহন মজুমদারের চোখের দিকে যেন কোনো আশ্বাস পাবার প্রত্যাশায় তাকালেন।

মজুমদারডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না। বোধ হয় বলার মতন কিছু ছিল না। সামনের দিকে তাকালেন, চোখের চশমা খুলে মুছলেন, তারপর বললেন, "কই, ভ্রমরকে একবার দেখি।"

"আজকাল খানিকটা ইমপ্রুভ করেছে বলেই মনে হয়—"

"ডাকুন একবার—দেখি।"

আনন্দমোহন ঘাড় ফেরাতেই অমলকে দেখতে পেলেন। বললেন, "অমল, ভ্রমরকে ডাকো একবার।"

অমল ভ্রমরকে ডাকতে চলল। সহসা তার আবার একটু ভাল লাগছে: যদি ভ্রমর না যায়, তার হাসপাতালে যাওয়া না হয়, তাহলে ভাল হয়। নাগপুরের হাসপাতালে গিয়ে ভ্রমর পড়ে থাকবে এই চিন্তা তাকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও কাতর করছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, ভ্রমর চলে গেলে সে এ-বাড়িতে একা থাকবে কি করে? তাকে এখনও দশ বারো দিন থাকতে হবে।

বসারঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে অমল হঠাৎ দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দরজার মাথায় তাকাল। মেহগনি কাঠের সেই যীশু মূর্তি। ভেন্টি-লেটারের ফাঁক দিয়ে আসা আলো অনেক দূরে সরে গেছে। অমল অত্যন্ত কাতর হয়ে যীশুর কাছে মনে-মনে ভ্রমরের না-যাওয়া প্রার্থনা করল।

খাবারঘরে হিমানীমাসির পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অমল ভ্রমরকে ডাকতে চলল।

"ভ্রমর কোথায় মাসিমা?"

"দেখ, ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল দেখলাম। কেন?"

"ডাক্তারবাবু ওকে দেখবেন।"

"ও!"

অমল ভ্রমরের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ঘরের সামনে রোদে ভ্রমর দাঁড়িয়ে ছিল। চুল খুলছিল। ওর পায়ের কাছে তার বেড়াল ঘুরঘুর করছে।

অমল বলল, "তোমায় বাইরে ডাকছে।"

"আমায়। কে ডাকছে?"

"ডাক্তারবাবু। মেসোমশাই রয়েছেন।"

ভ্রমর এমন চোখ করে অমলের দিকে তাকাল যেন মনে হল সে অমলকে জিজ্ঞেস করছে, কেন ডাকছে বল তো?

অমল বলল, "ডাক্তারবাবু তোমায় দেখবেন।...তোমাদের নাগপুরে যাবার কথা হচ্ছে।"

ভ্রমর বুঝতে পারল অথচ যেন পরিষ্কার সব জানতে পারল না। সামান্য বিস্মিত অথচ চিন্তিত মুখ করে বলল, "নাগপুর!"

অমল কিছু ভাবছিল, বলল, "তোমার শরীর যদি ভাল হচ্ছে দেখেন ডাক্তারবাবু, তবে হয়ত যেতে হবে না।" বলে অমল আজ এই মুহূর্তে আগ্রহের চোখে ভ্রমরকে দেখতে লাগল। সে দেখছিল, ভ্রমরের শরীর সেরে উঠছে কি না। মনে হল, আগের চেয়ে সেরেছে।

"তোমার কি রকম মনে হয়, ভ্রমর? আগের চেয়ে ভাল না?"

"খানিকটা।"

"তোমার মুখ মধ্যে একেবারে ফ্যাকাশে দেখাত, এখন অতটা দেখায় না।" অমল বলল, "তুমি সেরে উঠছ। এবার সেরে যাবে পুরোপুরি।"

ভ্রমর চুল খুলতে-খুলতে বলল, "তুমি যাও; আমি আসছি।"

অমল ফিরে এল। ফিরে এসে দেখল, মজুমদারডাক্তার এবং মেসোমশাই অন্য কথা বলছেন। ভ্রমর এখুনি আসছে জানিয়ে অমল সামান্য পাশে সরে গিয়ে ফুলগাছের টবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন কত বেলা হয়েছে, বেশ বোঝা যাচ্ছিল। এখানে থাকতে-থাকতে রোদের স্বভাব দেখে অমল বেলা বুঝতে শিখছে। প্রায় দশটা হবে। সূর্য সামান্য হেলতে শুরু করেছে, শিরীষ-গাছের তলায় দোলনার ছায়াটা বেঁকেছে সামান্য। আকাশ সাদাটে নীল, কালচে দু-চারটি রেখা লেগে আছে উত্তরের দিকে। ফটকের ও-পাশ দিয়ে টাঙা যাচ্ছে, ঘণ্টি শোনা যাচ্ছিল। একটা কুকুর ডাকছে কোথায়।

বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়ে অমল মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভ্রমর। ভ্রমর চা কেক-টেক সাজিয়ে নিয়ে বারান্দা দিয়ে আসছে। অমলের সঙ্গে চোখা-চোখি হল। অমল বুঝতে পারল, ভ্রমর তাকে গোল বেতের টেবিলটা ডাক্তার-বাবুদের সামনে এনে দিতে বলছে।

অমল বেতের গোল টেবিল মেসোমশাইদের সামনে এনে দিল। ভ্রমর চা ও খাবারের প্লেট সমেত ট্রে-টা নামিয়ে রাখল সাবধানে। চা তৈরী করেই নিয়ে এসেছে।

মজুমদারডাক্তার ভ্রমরকে দেখছিলেন। ভ্রমরের মুখ যেন খুব খুঁটিয়ে নজর করছিলেন। "কি, কেমন আছ?" মুখে বললেন, কিন্তু মনোযোগ বিন্দুমাত্র শিথিল হল না। "কি রকম লাগছে আজকাল?"

ভ্রমর কথা বলল না। চোখ নামিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

"কি, বলছ না যে! কেমন মনে হচ্ছে আজকাল?"

"ভাল।"

"কি রকম ভাল? বেশী না খানিকটা?" মজুমদার হাসিমুখে শুধোলেন।

"আগের চেয়ে ভাল।"

"ভাল!...ভালই লাগছে, কি বল?...শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে আজকাল খিদে ঘুম...কই, বসো, আমার সামনে বসো একবার, দেখি।"

বসার চেয়ার ছিল না। অমল বারান্দায় গিয়ে আরও একটা চেয়ার এনে দিল। ডাক্তারবাবুর মুখোমুখি রাখল। ভ্রমরের বসতে অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু বসল। একটু জড়সড়, বিব্রত ভঙ্গিতে।

চামচে করে কেক কেটে নিয়ে মজুমদারডাক্তার মুখে দিলেন। দিয়ে ভ্রমরের হাত তুলে নিয়ে ভ্রমরের চামড়ার রঙ দেখলেন যেন, তারপর হাত দেখলেন, শেষে নখের ডগা দেখতে লাগলেন।

"ওকে একটু ভালই দেখায় আজকাল—" আনন্দমোহন বললেন। যেন তিনি বার বার কথাটা ডাক্তারকে মনে করিয়ে নিজেও সাহস পেতে চাইছেন। আনন্দমোহন তাঁর চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন আলগা হাতে।

মজুমদারডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না, সামান্য ঝুঁকে বসে ভ্রমরের চোখের ভেতরকার কোল দেখতে লাগলেন। বার কয়েক দেখলেন। দেখে আবার সোজা হয়ে বসলেন, আর-একটুকরো কেক মুখে দিলেন। চোখের দৃষ্টি বেশীর ভাগ সময়েই ভ্রমরের ওপর। আরও একবার হাতের নখের ডগাগুলি পরীক্ষা করলেন।

মনে-মনে সম্ভবত কিছু ভাবছিলেন, হয়ত কোনো কথা মনে করার চেষ্টা করছিলেন। চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে চা খেলেন এক চুমুক। "জ্বরটর হয়েছে আর?"

"না।" ভ্রমর আস্তে করে মাথা নাড়ল।

"শরীরে কোথাও ব্যথাট্যথা আছে? পেটের দিকে যেটা হত?"

"না।" ভ্রমর মাথা নাড়ল।

অমল সঙ্গে-সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, ব্যথা আছে, ভ্রমরের পা থেকে কোমর পর্যন্ত ব্যথা হয়েছিল সে-দিনও। ক'দিন ছিল। ভ্রমর কথাটা কেন চেপে গেল অমল বুঝল না।

"তোমার তাহলে বেশ ভালই লাগছে, কি বল?...কই, দেখি, হাতটা বাড়াও। ঢিলে করে রাখ।" মজুমদারডাক্তার ভ্রমরের হাত সামনে নিয়ে এসে থাকলেন, আস্তে-আস্তে মণিবন্ধের খানিকটা ওপরে, ভেতর দিকের হাতের মাংসের ওপর যেন খুব আলতো করে আঙুল বোলালেন, বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে ক্যারামের গুটি মারার মতন জোরে মারলেন মাংসের ওপর, মেরে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পর-পর, থেমে-থেমে এই রকম চলল ক'বার, কখনও আঙুলের ঠোক্কর, কখনও চিমটি কাটার মতন মাংস টেনে দিলেন। শেষে বললেন, "আচ্ছা, এবার তুমি যাও।"

ভ্রমর চলে গেল। অমল সামনে থেকে সরে এল। তার মনে হল, সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। সরে এসে টবের কাছে দাঁড়াল, মেসোমশাইদের পিছন দিকে।

মজুমদারডাক্তার এবার বাকি চা শেষ করলেন আস্তে আস্তে। আনন্দমোহন সিগারেট দিলেন, সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া টানলেন মজুমদারডাক্তার।

আনন্দমোহন বেশ উদ্‌গ্রীব ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, বললেন, "ইমপ্রুভড্‌ মনে হল না তোমার?"

মজুমদার কিছু বললেন না সঙ্গে-সঙ্গে, খানিকটা পরে বললেন, "খানিকটা।" তিনি আর কিছু বললেন না যদিও, তবু তাঁর গাম্ভীর্য ও সহসা অবিচ্ছিন্ন নীরবতা কেমন কঠিন মনে হল। অদ্ভুত একটি আশঙ্কা অকারণে ঘনিয়ে আসছিল যেন।

অর্ধেকটা সিগারেট চুপচাপ শেষ করার পর মজুমদারডাক্তার এবার বললেন, "আপনি নাগপুরে যান একবার। যাওয়া ভাল।"

আনন্দমোহন উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, মজুমদার নাগপুরে যাবার কথা আর তুলবে না। হতাশ গলায় বললেন, "তুমি এখনও ইনসিস্ট করছ?"

"হ্যাঁ, আপনি যান।" মজুমদার আনন্দমোহনের চোখের দিকে তাকালেন, থেমে-থেমে বললেন, "আমি বড় ডাক্তার নই, বিশ্বাসদা। আপনি আমার উইকনেসও বুঝতে পারবেন। এ-রকম কেস হাতে রাখতে আমার ভয় হয়..."

"তুমি ত বল অ্যানিমিয়া।"

"কিন্তু ক্রনিক অ্যানিমিয়া ভাল না। আমি বোধ হয় গত এক দেড় বছর ধরের ভ্রমরের ট্রিটমেণ্ট করছি। কখনও এটা, কখন ওটা লেগেই আছে। ওষুধ-পত্রে অ্যানিমিয়া একটু কমে, ক'দিন পরে আবার। খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠেছে। ডাক্তারখানায় ওর সব ব্লাড রিপোর্ট-টিপোর্ট আমি কালও দেখেছি। বেটার টু টেক সাম গুড অ্যাডভাইস।"

"খারাপ কিছু?" আনন্দমোহন বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, "টিউবার-কুলোসিস?"

"না, সে-রকম কিছু নয়।"

"তবে?"

"ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে ভয় হয়, লিউকোমিয়ায় না গিয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।"

"লিউকোমিয়া! সেটা কি?"

"রোগটা খারাপ, খুব ভয়ের রোগ; এ ডিজিজ অব ব্লাড : ব্রেকিং অফ রেড ব্লাড সেলস্—" মজুমদারডাক্তার সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে পা দিয়ে নিবিয়ে দিলেন। দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কথা বলার মতন করে বললেন, "ক্রনিক অ্যানিমিয়া, এনলার্জমেণ্ট অফ দি স্প্লীন্ অ্যান্ড লিম্ফ্যাটিক গ্লান্ডস মোটেই ভাল না।" চোখ ফিরিয়ে মজুমদারডাক্তার এবার অত্যন্ত সহানুভূতিবশে আনন্দমোহনের দিকে তাকালেন, আস্তে-আস্তে বললেন, "বিশ্বাসদা, আপনি আমার স্বজাতি, আমরা প্রবাসে রয়েছি: যদি আমার হাতে আপনার মেয়ের কিছু মন্দ হয়ে যায়, সে-আপসোস আমার যাবে না। আমি রিস্ক নিতে রাজী না। আপনার মেয়ে, গেলে আপনারই বেশী যাবে। আপনি নাগপুরে যান, আমি ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছি, চিঠিপত্র লেখা-লেখি করেছি।...হয়ত আমারই ভুল হচ্ছে রোগ বুঝতে। তবু যান একবার, দেখিয়ে আসুন—"

আনন্দমোহন পাথরের মতন বসে. তাঁর মুখে খড়ির দাগ ফুটছে যেন, শুকনো বিবর্ণ দেখাচ্ছে। চোখের পলক পড়ছিল না, মুখ হাঁ হয়ে ছিল। ভীষণ ভয় পেলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হয়ে থাকে, আনন্দমোহন সেই রকম

হয়ে গিয়েছিলেন।

বসে থাকতে বোধ হয় অস্বস্তি লাগছিল মজুমদারডাক্তারের। গলার শব্দ করে, চেয়ার সরিয়ে, সামান্য শুকনো করে কেশে উনি শেষ পর্যন্ত উঠলেন। বললেন, "কবে যাবেন ঠিক করে আমায় জানাবেন। যত আরলি হয়...! আমার রিপোর্ট আর একটা চিঠি দিয়ে দেব—"

মজুমদার চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আনন্দমোহন ধরা বসা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটা বাঁচবে না?"

মজুমদার দাঁড়ালেন। সামান্য সময়ের জন্যে তাঁর মুখ হঠাৎ খুব ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অত্যন্ত বিব্রত ও আড়ষ্ট হলেন। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "মরা বাঁচা ভগবানের হাত।...তা বলে এখন থেকেই ভেঙে পড়বেন না। হয়ত আমার ভুল—" কথা শেষ না করেই মজুমদারডাক্তার বিদায় নিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামলেন আস্তে-আস্তে, অন্যমনস্ক। মোটরবাইক ঠেলে ঠেলে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অমল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পায়ের তলায় যেন মাটি নেই, সব ফাঁকা লাগছিল। অসাড়, স্পন্দনহীন। নিজের হাত-পা, মুখ—কোনো কিছু সে অনুভব করতে পারছিল না। চোখের সামনে রোদ-ভরা বাগান, গাছ, ফুল, পাতা সবই স্থির হয়ে আছে, কিন্তু অমল কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, অত্যন্ত ধারালো এবং ধাঁধানো রোদের দৃষ্টি যেমন সহসা অন্ধ হয়ে যায়, অমল সেই রকম লাগছিল।

ডাক্তারবাবুর মোটরবাইক যখন গেটের বাইরে গিয়ে হঠাৎ এঞ্জিনের তীব্র ও বিশ্রী একটা শব্দ তুলল, তখন অমল যেন তার চেতনা ফিরে পেল। সে কেঁপে উঠল হঠাৎ, পা কাঁপতে লাগল, হাতের তালুতে ঘাম জমেছে, বুক ধকধক করছিল।

মানুষের সমস্ত ভয় অন্ধকারে। অন্ধকার তাকে কোনো কিছু জানায় না, দেখায় না। অমল খুব ভয় পেয়েছিল। মজুমদারডাক্তারের কথাবার্তার ভঙ্গি থেকে সে অনুভব করতে পেরেছিল, ভ্রমরের কোনো কঠিন রোগ হয়েছে; মেসোমশাইয়ের মুখের ভাব দেখে সে বুঝতে পারছিল, উনি ভীষণ বিচলিত ও ভীত হয়ে পড়েছেন। ভ্রমর বাঁচবে কি বাঁচবে না—এই ভীষণ কথাটাও তিনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ডাক্তারবাবুও সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

অসুখটা কি, কেমন তার চেহারা, কি হয় না-হয়, অমল কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। সাধারণ জ্বরজ্বালা, হাম, জল-বসন্ত এমন কি টাইফয়েড হলে অমল বুঝতে পারত; সে এ-সব দেখেছে এবং জানে। কিন্তু ভ্রমরের অসুখ তার জ্ঞানের বাইরে, কখনও সে শোনে নি নামটা, কি হয় না-হয় তার জানা নেই। তবু অসুখটা যে ছোট বা সাধারণ নয় বোঝা যাচ্ছিল, নয়ত ডাক্তারবাবু ভ্রমরকে ওভাবে নাগপুরের হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে জোর করতেন না; মেসোমশাইকে বলতেন না, "মেয়ে গেলে আপনারই বেশী যাবে...।"

অমলের ভাল লাগছিল না। তার মনে হচ্ছিল, ভ্রমর যেন কাল কিংবা পরশু এ-বাড়ি ছেড়ে নাগপুরের হাসপাতালে চলে যাবে। নাগপুর কোথায়, কতদূরে, অমল জানে না; সেখানের হাসপাতাল কেমন কে জানে; ভ্রমরকে সেখানে

কি করা হবে, ভ্রমর কেমন থাকবে—অমল কিছু দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না। অমলের চোখের আড়ালে কি ঘটবে সে কল্পনা করবার চেষ্টা করল, পারল না; বরং নানারকম ভীতিকর দুশ্চিন্তা এসে তাকে আরও আকুল করে তুলল।

দুপুরবেলায় লুকিয়ে-লুকিয়ে অমল ভ্রমরের হোম সাইন্স-এর বই দেখল, কিছু পেল না। মেসোমশাইয়ের ঘর থেকে চেম্বার্স ডিকশনারী এনে ঘাঁটল। বানান না-জানা থাকায় কতক্ষণ যে ঘাঁটতে হল অভিধান! শেষে শব্দটা পেল। অমল বুঝল, এ-রোগে মানুষের শরীরের শ্বেত রক্তকণিকা খুব বেড়ে যায়। অমল জানত, শরীরের রক্তে লাল এবং সাদা দু-রকম রক্তকণিকা থাকে; কিন্তু সে জানত না এদের কমাবাড়ায় কি ক্ষতি হতে পারে। তার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, জানাবার লোক ছিল না। তার মনে হল, হয়ত এমন হতে পারে, রক্ত আর রক্ত থাকে না, শ্বেতকণিকায় ভরে যায়। অমলের ভয় হল ভাবতে। সে আর ভাবতে চাইল না।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেলে অমল মেসোমশাইয়ের চেহারা দেখে ভয় পেল। মেসোমশাইকে খুব উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিহ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর চোখ মুখ যেন ক্রমশ বসে আসছে, উদ্বেগের আঁচড়গুলি ও'র মুখের সদাপ্রসন্নতা ও হালকা ভাবটি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছে। হিমানীমাসিকেও বিকেল থেকে আরও গম্ভীর চুপচাপ দেখাচ্ছিল। এবং বিকেল থেকেই বেশ বোঝা গেল, এই বাড়িতে খুব অদৃশ্যভাবে একটি অস্বস্তিকর ভীত উদ্বিগ্ন আবহাওয়া নেমে এসেছে।

মেসোমশাই বিকেল ফুরিয়ে যাবার পর-পরই যেন কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। অমল লক্ষ করল, তিনি খুব অন্যমনস্ক ও ব্যস্ত হয়ে আছেন। অমল এই সময় ভয়ে-ভয়ে একবার জিজ্ঞেস করল, "ভ্রমরের কি অসুখ, মেসোমশাই?" আনন্দমোহন বললেন, "খুব খারাপ অসুখ বাবা। মেয়েটার কি হবে কে জানে! ওই আমার একটি মাত্র মেয়ে।" বলতে-বলতে আনন্দমোহন ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তারপর অমল বুঝতে পারল উনি ডাক্তারবাড়ি যাচ্ছেন। এ-বাড়ির গোপন উদ্বিগ্নতার মধ্যেই সন্ধে নামল। সন্ধের পর ওরা তিনজনে বসে ক্যারাম খেলছিল—অমল, কৃষ্ণা, ভ্রমর। অমল খেলতে পারছিল না। তার মন ছিল না খেলায়, চোখও ছিল না। ক'বারই হারল। খেলা শেষ হয়ে গেলে কৃষ্ণা উঠে গেল।

ভ্রমর বলল, "তুমি আজ খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছ যে! সারাদিন চুপচাপ।"

অমল জবাব দিল না। আজ সারাদিন সে ভ্রমরকে এড়িয়ে-এড়িয়ে থাকছে। ভ্রমরের কাছে আসতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি ভ্রমর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে ডাক্তারবাবুর কথা তবে অমল কি বলবে! বা অমলও যদি বোকার মতন আচমকা কিছু বলে ফেলে ভ্রমরকে অসুখের কথা- তবে? কে জানে, কাছাকাছি থাকলে অমল কি বলে বসবে, কিংবা অমলের মুখ দেখে ভ্রমর কি বুঝবে—এইসব চিন্তা করে অমল একটু দূরে-দূরেই কাটিয়েছে।

এখন ভ্রমরের কথায় অমল হঠাৎ বেশ ভয় পেল, তার বুক কাঁপল; সে ভাবল, ভ্রমর এখুনি তাকে অসুখের কথা জিজ্ঞেস করবে। ভ্রমর যাতে সে সুযোগ না পায় অমল তাড়াতাড়ি অন্য কথায় চলে গেল। "কাল নতুন বছর পড়ছে নিউ ইয়ার্স ডে। কাল তোমরা কি করবে?"

ভ্রমর অমলকে দেখছিল। ওর চোখের দৃষ্টি পরিকার নয়। ভ্রমর বলল,

"কাল সকালে তা বলে আমি আর গানটান গাইছি না; তুমি খুব ঘুমিয়ো।"

অমল মুখ তুলল। কথাটা তার কানে ঠাট্টার মতন শোনাল না। কি বলবে বুঝতে না পেরে অমল বলল, "কেন? নতুন বছরে তোমাদের গান নেই?"

"আছে; অনেক আছে—" ভ্রমর বলল, তারপর অল্প সময় থেমে খুব মৃদু জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানো না?"

"কি?"

"কাল বাবা আমায় নিয়ে নাগপুরে যাচ্ছে।"

"কা-ল?" অমল চমকে উঠল যেন।

"মা বলেছে, কাল। কখন যাওয়া হবে জানি না, রাত্তিরে বোধ হয়।"

অমল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল। যেন সে ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার অজ্ঞাত অতি দূর কোনো শহরের একটি ভীষণ বড় হাসপাতালের স্তব্ধ নির্জন একটি কক্ষ দেখছিল। ভ্রমর হাসপাতালের সাদা কনকনে বিছানায় শুয়ে আছে। তার লাল রক্তকণাগুলি প্রতি মুহূর্তে যেন ফুরিয়ে আসছে। অমলের মুখ কেমন ভেঙে আসছিল। কান্না এসে তার গাল ও ঠোঁটের মাংস কুঁচকে দুমড়ে দিচ্ছিল। ঠোঁট কাঁপছিল।

ভ্রমর বলল, "আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত তুমি থেকো, থাকবে না?"

মাথা হেলিয়ে অমল বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, সে থাকবে, কিন্তু তার আগেই অমল ছেলেমানুষের মতন কেঁদে উঠল।

১১

গাড়ি দুটো চলতে শুরু করেছিল। সামনের টাঙায় আনন্দমোহন আর কৃষ্ণা, পেছনে ভ্রমর অমল। মালপত্র বেশী নেই, তবু দুটো সুটকেশ, বাস্কেট, টুকিটাকি আরও কিছু আনন্দমোহনরা নিয়েছেন. ভ্রমরদের টাঙায় মোটা হোল্ডঅল আর বেতের টুকরিটা কোচোআনের পাশে বসানো রয়েছে। ভ্রমরকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে এখন সবাই ব্যস্ত; এমন কি মেসোমশাই বার বার বলা সত্ত্বেও হিমানী-মাসি ভ্রমরকে গাড়িতে উঠিয়ে দেবার সময় অমলকে বললেন, একটু সাবধানে নিয়ে যেও।

কটেজগুলো ছাড়িয়ে গাড়ি মোতি রোডে পড়ল। সামনের টাঙাটা সামান্য এগিয়ে আছে, বিশ পঁচিশ গজ হবে হয়ত। এখন সাড়ে সাতটা সন্ধে, আটটা পঞ্চাশে ট্রেন; স্টেশনে পৌঁছতে সোয়া আটটা হবে।

আকাশে চাঁদ রয়েছে। জ্যোৎস্না রাত্রি। কুয়াশা এবং হিম চাঁদের আলো শুষে রেখেছে। খুব পরিষ্কার নয়, জ্যোৎস্না, মরা-মরা লাগছিল, মলিন আয়নার কাচের মতন। কনকনে শীত, বাতাস যেন গা গুটিয়ে বসে পৌষের প্রখর ও শুকনো ঠান্ডাকে জমে উঠতে দিচ্ছিল।

ভ্রমরকে যথাসাধ্য সাবধানে বেরুতে হয়েছে, যাতে ঠান্ডা না লাগে তার জন্যে বাবা নিজেই একশোবার করে এক কথা বলেছে : তুই সোয়েটারের ওপর লং-কোট পরবি, তুই পুরো মোজা পরবি, স্কার্ফ নিবি—মাথা কানে যেন ঠান্ডা না লাগে, ট্রেনে ঠান্ডা লাগবে খুব। ভ্রমর গরম সব কিছুই পরে বেরিয়েছে : ভেস্ট, গরম কোট, মোজা—বাদ দেয় নি কিছু। গাড়িতে ওঠার সময় হিমানী-মা'র কথায় মাথার স্কার্ফও বেঁধে নিয়েছে।

মোতি রোডে গাড়ি ওঠার পর মনে হল, গাড়ির চাকা আরও অক্লেশ হল, ঘোড়ার কদম জোর পেল।

ভ্রমরই কথা বলল প্রথমে। বলল, কারণ, অমল একেবারেই চুপচাপ ছিল, সারাদিনই প্রায় চুপচাপ থেকেছে, বিকেল থেকে তাকে অনেকক্ষণ ভ্রমর বাড়িতে দেখতে পায় নি, অমল রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভ্রমরের ভাল লাগে নি। এভাবে অমলকে রেখে যেতে, ছেড়ে যেতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে; তবু যখন উপায় নেই, যখন ভ্রমর একটা দরকারী কাজে যাচ্ছে—ডাক্তার দেখাতে, তখন অমলের খানিকটা বোঝার মন ও সহ্য করার শক্তি থাকা উচিত ছিল। কি রকম ছেলেমানুষ! আমি না-হয় আগে যাচ্ছি, নয়ত আর ক'দিন পরে তুমিও ত যেতে, তখন কি ভ্রমর এইরকম করত, করলে তোমার কেমন লাগত বল! সন্ধে-বেলায় অমলের সঙ্গে এক ফাঁকে দেখা হলে ভ্রমর বলেছে কথাটা 'তুমি এরকম করছ কেন, ছেলেমানুষের মতন! দুঃখ যেন নিজেরই, আর কারও নয়, না—!

যখন তুমি যাবে আমিও এইরকম করব—একবারও কাছে আসব না।'

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ভ্রমরের নিজের মনও বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হওয়া স্বাভাবিক; সে আগে আর কখনও এমন করে বাড়ির বার হয় নি। তা ছাড়া, মানুষের আচরণ এক ধরনের অর্থ বোঝায়। বাবা, হিমানী-মা এবং অমলের ব্যবহার থেকে ভ্রমর অনুভব করতে পারছিল, কোথাও যেন কিছু একটা ঘটেছে। এতকাল বাবা তার ব্যাপারে খুব একটা গা দিয়ে কখনও কিছু করে নি, হচ্ছে হবে, চলছে চলুক করে কাটিয়েছে, এখন একেবারে অতিব্যস্ত। কেন এত ব্যস্ত? কেন হিমানী-মা তার ওপর হঠাৎ মায়া মমতা দেখাতে শুরু করল? হিমানী-মা অবশ্য বাবার মতন ব্যস্ত ভাব দেখাচ্ছে না, মাথা গোলমাল হয়ে যাবার মতন ছটফটে ব্যবহারও কিছু করে নি। তবু হিমানী-মা'র সামান্য কিছু কথা, জিনিসপত্র গোছগাছ করে দেবার চেষ্টা থেকে, চোখ এবং মুখের ভাব থেকে বোঝা যাচ্ছিল, ভ্রমরের অসুখের ধাত নিয়ে এই একটা কি দেড়টা দিন মা বিরক্ত নয়। বরং এমন কথাও মা বলেছে যা মানুষ মায়া মমতা অনুভব করলেই বলে। হিমানী-মা আজ সন্ধের মুখে-মুখে একবার ভ্রমরকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণার ঘরে বসেছে। তখন কৃষ্ণা ঘরে ছিল না। চুপচাপ একটু বসে থাকার পর হিমানী-মা বলল, 'দূরে যাচ্ছ, একা থাকবে—ভয় পেও না, মন খারাপ করো না, বুঝলে।...প্রভুকে সব সময় মনে করো। তিনিই মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গী, রোগ বল দুঃখ বল, তাঁর চেয়ে বড় ভরসা আর নেই।' এই বলে হিমানী-মা চোখ বন্ধ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ, যেন প্রার্থনা করল মনে-মনে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রমরের মাথায় একটু হাত ছুঁইয়ে রাখল, 'সাবধানে থেকো, মন ভাল রেখো।'...হিমানী-মা'র ব্যবহার এবং কথাবার্তায় ভ্রমরের তখন মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হয়ত সে কেঁদে ফেলত, অনেক কষ্টে সামলেছে। কিন্তু ভ্রমরের কেমন সন্দেহ হল, হঠাৎ হিমানী-মা এত আদর-যত্ন করে কথা বলছে কেন? কেন এত উপদেশ দিচ্ছে? ডাক্তারের কাছে অসুখ-বিসুখ দেখাতে গেলে মানুষ কি এইরকম করে? তবে?..অমলের ব্যবহারও ভাল লাগছিল না ভ্রমরের। অমল সারাক্ষণ আড়াল-আড়াল হয়ে থাকছে। মুখ শুকনো, করুণ, কেমন যেন নিষ্প্রাণ; চোখ দুটি উদাস, চোখের তলায় জল জমে থাকার মতন ভিজে-ভিজে। ভ্রমর বুঝতে পারছিল না, এই অমলই এতদিন তাকে বড় ডাক্তারের কথা, জব্বলপুরে যাবার কথা বলেছে; বলেছে ভ্রমরের শরীর ভাল করা উচিত, ভ্রমরের অসুখ সারাবার জন্যে তার কত আগ্রহ ছিল, অথচ আজ যখন ভ্রমর শরীর থেকে রোগ তাড়াতে চলেছে তখন অমল একটুও সুখী নয়, সান্ত্বনা দিচ্ছে না, আশা-ভরসার কথা বলছে না। কেন? অমল কেন এতটা মুষড়ে পড়েছে?

ভ্রমর তার সন্দেহ এবং আশঙ্কার কথা ক্ষীণভাবে জানাল এবার। সে স্পষ্ট করে কিছু বুঝছিল না, জানতে পারছিল না বলেই, এখন—গাড়িতে উঠে, যেতে-যেতে, অমলকে খুব কাছে এবং একা পেয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করল, প্রথম কথা বলল, "আমার কি হয়েছে বল ত?"

অমল রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন পর্যন্ত সে ভ্রমরের দিকে চোখ তুলে তাকায় নি, একবার বুঝি তাকিয়েছিল—গাড়ি যখন মোড় ঘুরে মোতি রোডে উঠল। ভ্রমর টাল খেয়ে পড়ে যায় কি না, ঝুঁকে পড়ে

কি না দেখছিল। ভ্রমর সামান্য দুলে আবার সোজা হয়ে বসায় অমল চোখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। গাড়ি চলছিল।

ভ্রমরের কথা কানে গিয়েছিল অমলের, তবু সে মুখ তুলল না, তাকাল না। সামান্য অপেক্ষা করে ভ্রমর অমলের গায়ে হাত রাখল, "এই—!"

অমল সামান্য মুখ তুলল। সে মনে-মনে কতবার শক্ত ও স্থির হবার চেষ্টা করেছে, পারে নি। এখন সে খুব ভয় এবং ব্যাকুলতার মধ্যে শক্ত হবার চেষ্টা করল। ভ্রমরের ডাকে একটু শব্দ করল কোনো রকমে।

"আমার কিসের অসুখ হয়েছে, জানো তুমি?" ভ্রমর জিজ্ঞেস করল।

"না। আমি কি করে জানব!" অমল গলার মাফলার কানের ওপর তুলে দিতে দিতে বলল, কোটের কলারও তুলে দিল। যেন সে ভ্রমরের কাছ থেকে মুখ আড়াল করে রাখতে চাইছে।

"তা হলে—?" ভ্রমর শুধোল, তার গলার স্বরে সন্দেহ ছিল।

"কি?"

"সবাই এ-রকম করছে কেন? বাবা, মা, তুমি—?"

"এ-রকম মানে, কি রকম?" অমল সব জেনেশুনেও ভয়ে-ভয়ে বলল।

"সবাই যে খুব ভয় ভাবনা করছে, ছটফট করছে—"

"করছে! কই..." অমল রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার মাথায় কোনো রকম বুদ্ধি খেলছিল না। ভ্রমরকে এখন আগাগোড়া সামলে যেতে হবে, মিথ্যে বলতে হবে, ভরসা দিতে হবে। কিন্তু কি করে সামলাবে অমল! তার অত সাহস কোথায়, জোর কোথায়। মনে-মনে অমল ভগবানের কাছে সাহস চাইল।

"এই শোনো—" ভ্রমর সামান্য পরে আবার বলল; অমলের দিকে ঝুঁকে বসল।

"উঁ—"

"আমার অসুখ কি খুব খারাপ?"

"খারাপ! কে বলল খারাপ!"

"তুমি জানো না?"

"না।"

"বাবা তোমায় কিছু বলে নি?"

"না, না।" অমল জড়সড় হয়ে বসল, যেন তার শীত করছে খুব।

অল্প চুপ করে থেকে ভ্রমর এবার হিমানী-মা'র কথাটা বলল, সন্ধেবেলায় কৃষ্ণার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বলেছে হিমানী-মা ভ্রমরকে। অমল নীরবে শুনল। হিমানীমাসির ওপর তার রাগ এবং ঘৃণা হল। এ-বাড়ির সকলের ওপরই অমলের বিরক্তি, রাগ ও ঘৃণা জমেছে কাল থেকে। সবাই মিলে এরা ভ্রমরকে উপেক্ষা করে, একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে আস্তে-আস্তে মেরেছে, আজ খুব বড় করে স্নেহ দয়ামায়া দেখাতে এসেছে! নিষ্ঠুর, এরা সবাই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অমানুষ।

"কি জানি, আমার এক একবার মনে হচ্ছে, আমার খুব কঠিন অসুখ—" ভ্রমর বলল মৃদু গলায়, হতাশ গলায়। বলে নিশ্বাস ফেলল, দীর্ঘনিশ্বাস। বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ওকে।

অমল প্রাণপণে নিজেকে ভয় এবং বিহ্বলতা থেকে তুলে নেবার চেষ্টা

করছিল, বলল, "তোমার সব মনে মনে; নিজেই নিজের অসুখের কথা ভেবে নিচ্ছ।"

"ভাবছি কোথায়! আমার কেমন মনে হচ্ছিল, তাই বললাম।"

"হবেই বা কেন?"

"তোমরা তাহলে এ-রকম করছ কেন?"

"আমি কিছু করি নি—"

অমলের শ্বাসনালী ঠান্ডা, বুক শক্ত পাথর-পাথর লাগছিল, তবু অমল বলল, "আমার একেবারে ভাল লাগছে না, তাই চুপ করে থাকছি।" বলে সামান্য সময় অমল আর কিছু বলল না, শেষে ভ্রমরকে যেন সন্দেহ করতে দেবে না, কোনোরকম, তাই আবার বলল, "হাসপাতাল-টাসপাতাল পাঠাতে হলে মানুষ এমনিতেই একটু ভয় পায়; তোমার বেলায় আবার বিদেশে, নাগপুরে—তাই হয়ত মেসোমশাই মাসিমা ওরকম করছেন।"

ভ্রমর মন দিয়ে শুনল। শুনতে-শুনতে সে মাথায় বাঁধা স্কার্ফটা কানের পাশ থেকে সরিয়ে দিল একটু, যেন অমলের কথাবার্তা সে বাকি সময়টুকু মন দিয়ে শুনতে চায়। ভ্রমর বলল, "আমিও তাই ভাবছিলাম। ডাক্তার দেখানো পর্যন্ত যা ভাবনা, তারপর ত ফিরেই আসব।"

অমল মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, যেন তাই হয়; ভ্রমর ফিরে আসে তাড়াতাড়ি। তারপরই সে ভাবল, কাল থেকে অনেকবার অমল বিশ্বাস করতে চাইছে, ভ্রমর ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে আসবে, সুস্থ নীরোগ হয়ে উঠবে। মজুমদারডাক্তার এমন কথা ত বলেন নি যে, ভ্রমরের ঠিক ওই রোগটাই হয়েছে। বরং তিনি বলেছেন, তাঁর ভুল হতে পারে; সময় থাকতে সাবধান হবার জন্যেই যা বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া। ডাক্তাররা কি ভুল করে না! হামেশাই করে। অমলের যখন টাইফয়েড হল তখন তাদের মধুপুরার ডাক্তারকাকা প্রথম দশ বারো দিন কখনও বলল ঠান্ডা লেগে জ্বর, কখনও বলল ম্যালেরিয়া হতে পারে, কখনও বলল লিভার বেড়ে জ্বর হয়েছে। শেষে টাইফয়েড সাব্যস্ত হল। ভ্রমরেরও সেই রকম হতে পারে, হয়ত রোগটা মোটেই ভয়ের নয়, ঠিক-ঠিক ধরা পড়লে সেরে যাবে তাড়াতাড়ি। ,

"আমি কিন্তু খুব ভয় পাই নি, জানো..." ভ্রমর বলল হঠাৎ।

অমল মুখ ফিরিয়ে ভ্রমরের দিকে তাকাল। স্কার্ফের মধ্যে ভ্রমরের ছোট্ট মুখ ঘোমটার তলায় বউ-বউ দেখাচ্ছে। চাঁদের আলো না পড়ায় পরিষ্কার করে মুখটি দেখা যাচ্ছিল না।

"তোমরা যদি ওরকম না করতে আমি একটুও ভয় পেতাম না!" ভ্রমর যেন অমলদেরই সান্ত্বনা সাহস দিচ্ছে এমন গলা করে বলল, "আমার ভয় কম।"

"ভয়-টয়ের কিছু নেই।" অমল খানিকটা সাহস পেয়েছে যেন এতক্ষণে।

"থাকলেও বা কি!...তুমি লাজার-এর গল্প জানো?"

"না, লাজার কে?"

"বাইবেলে আছে। লাজার একটা লোকের নাম, মরিঅমের ভাই। যীশুকে ওরা খুব ভালবাসত, যীশু ওদের খুব ভালবাসতেন।" ভ্রমর ধীরে ধীরে বলল, "লাজার-এর খুব অসুখ হল, সে মরে গেল, তাকে কবর দিয়ে দেওয়া হল। যীশু তখন অনেকটা দূরে এক জায়গায় ছিলেন। লাজার-এর অসুখের কথা

শুনে তিনি বলেছিলেন, লাজার-এর অসুখের শেষ মৃত্যু নয়, তার অসুখ প্রভুকে মহিমান্বিত করবে।”

অমল মন দিয়ে গল্প শুনছিল না, তবু শুনছিল। তার মনে হল, ভ্রমর বোকার মতন কথা বলছে।

ভ্রমর বলল, “লাজার মারা গিয়েছিল, কিন্তু চার দিন পরে যীশু তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।”

“এ-সব গল্প!” অমল অন্যমনস্কভাবে বলল।

“গল্প কেন!...তুমি কিছু বিশ্বাস কর না। ভগবানকে যে ভালবাসে সে মরে না, ভগবান তাকে বাঁচান।” ভ্রমর এমন সরল গলায় বলল যেন ভগবান তাকে বাঁচাবেন, না বাঁচালে তিনি মহিমান্বিত হবেন না।

অমল কিছু বলল না। ভগবান কি সত্যি এত দয়ালু! অমল কেমন বিতৃষ্ণা এবং রাগের সঙ্গে ভাবল, ভগবান এত দয়ালু বলেই কি তোমায় অসুখে ভোগাচ্ছেন? কেন তোমার মা নেই, ভ্রমর? কেন হিমানীমাসি তোমায় এতকাল অযত্ন করে এসেছেন? অমল ভগবানের ওপর রাগ এবং ঘৃণার চোখ করে তাকাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হঠাৎ কোথায় বাধা পেল, ভয় পেল। তার মনে হল, কি দরকার, ভ্রমর হাসপাতালে যাচ্ছে, ভগবান দয়ালু হোন না-হোন, নির্দয় হতে পারেন; যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, ভ্রমরের ক্ষতি হতে পারে। অমল আর ও-বিষয়ে ভাবতে চাইল না।

টাঙাগাড়ি মোতি রোডের প্রায় শেষাশেষি এসে গিয়েছিল। আনন্দমোহনদের গাড়িটা একটু তফাতে চলে গেছে। ঘোড়াটা হয়ত বেশী তেজী। অমলদের ঘোড়া সমান তালেই ছুটছে, তার সারা গায়ের মচমচ শব্দ বাতাসে বাজছে, কান না করলে শোনা যায় না, গলার ঘণ্টি এই নির্জনতায় ঝুমঝুমে ঝুমঝুমে করে নিরবচ্ছিন্ন একটি সুর সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। আকাশে চাঁদটি কোথায় রয়েছে অমলরা দেখতে পাচ্ছে না, টাঙার মুখ না ফেরা পর্যন্ত পাবে না, জ্যোৎস্না আরও অস্বচ্ছ হয়ে আসছে বুঝি, ময়লা তুলোর মতন দেখাচ্ছে, যেন প্রাণ নেই; কুয়াশা হিমে আলোর কণাগুলি ভিজে থাকায় আলোক ফুটছে না। মোতি রোডের বাড়িগুলি নিস্তব্ধ, এক একটি পাঁচিল এবং বাগান পেরিয়ে এলে মনে হচ্ছে ভৌতিক অসাড় কোনো বাসস্থান পার হয়ে এল গাড়িটা।

ভ্রমর আরও একটু সরে এল অমলের দিকে, ঠাণ্ডা লাগছিল ঘাড়ের কাছটায়। অমল ভ্রমরের পোশাকের স্পর্শ অনুভব করতে পারছিল, এমন কি ভ্রমরের গায়ের ভার তার গায়ে লাগছিল।

ভ্রমর বলল, “তোমার মুখ দেখলে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।” বলে অনেকটা যেন অভিমান করার মতন করে ঠোঁট মুখ ফোলাল, চোখের দৃষ্টি ক্ষুব্ধ করল, “তুমি যখন যাবে তখন আমার মন খারাপ হবে না? তবে!”

অমল ব্যথিত উদাস চোখ ভ্রমরের চোখে রাখল। জ্যোৎস্নার মরা আলোর ছায়ায় ভ্রমরকে স্বপ্নের মতন দেখাচ্ছে। আছে, তবু যেন নেই; খুব কাছে অথচ অনেকটা দূরের মানুষ। অমল এই মুহূর্তে বোধ হয় নিজের কাছে কোনো রকম বিশ্বাস ও সান্ত্বনা পেতে চাইল। হাত বাড়িয়ে ভ্রমরের কোলে রাখল। রেখে মনে হল, ভ্রমর তার সামনে তার পাশেই রয়েছে। অমল কোনো

কথা বলতে পারল না।

"আমি ফিরে আসার পরও তোমার যাওয়া হবে না।" ভ্রমর গাঢ় গলায় বলল, "একেবারে মাসের শেষে যেও, জানুআরির শেষে।"

অমল এই মুহূর্তে বিশ্বাস করল ভ্রমর ফিরে আসবে, জানুআরির শেষ পর্যন্ত থেকে যাবার কথাও সে ভাবল। বলল, "বাড়িতে লিখতে হবে।"

"লিখে দিয়ো। তোমার তাড়াতাড়ি কি, চাকরি করতে যাচ্ছো না ত, তবে—!"

অমল চুপ করে থাকল। কয়েকটা দেবদারুগাছের ছায়ার তলা দিয়ে টাঙাটা এগিয়ে এল, এগিয়ে এসে বাঁ-হাতি মোড় ঘুরল। সাইকেলের অতি ক্ষীণ আলো ফেলে এক জোড়া লোক এ-সময় তাদের পেরিয়ে উলটো মুখে চলে গেল। কোচোআন পা দিয়ে ঘণ্টি বাজাল বারকয়েক, তার মনে হয়েছিল সামনে কেউ রয়েছে, বস্তুত কেউ ছিল না, কুয়াশার মধ্যে একটা ভাঙা ঝোড় মানুষের মতন দেখাচ্ছিল, যেন কোনো মানুষ রাস্তার পাশ ঘেঁষে বসে আছে।

তফাত-তফাত কয়েকটা একতলা বাড়ি পেরিয়ে ফাঁকায় পড়ল ভ্রমরদের গাড়ি। সামান্য দূরে আনন্দমোহনদের টাঙা ছুটছে। ফোটা-ফোটা দুটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ছিল।

ভ্রমরই আবার কথা বলল। "আমার ঘরে তোমার সেই কালো মোজা দুটো পড়ে আছে, গোড়ালি সেরে রেখেছি, নিয়ে নিয়ো।"

অমল সাড়া দিল না। ভ্রমরকে সে দেখছিল না, রাস্তা দেখছিল। রাস্তাটা যেন পায়ের তলা দিয়ে চলে যাচ্ছে, ক্রমাগত চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোয় মোরম-পেটোনো এই রাস্তা ঘোলাটে দেখাচ্ছিল, কোথাও-কোথাও পাথরের গুঁড়ো সামান্য চকচক করছে। অমলের মনে হচ্ছিল, তাদের পায়ের তলা দিয়ে ঘোলাটে জল বয়ে যাচ্ছে।

"তুমি একটাও কথা বলছ না।" ভ্রমর বলল।

হুঁশ করল অমল। "বলছি ত!"

"কই বলছ? চুপ করে বসে আছ।"

অমল মুখ তুলে ভ্রমরের দিকে তাকাল। নিশ্বাস ফেলল বুক হালকা করার জন্যে। "আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

ভ্রমর নিবিড় ও অতি বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল। টাঙার মুখ ঘুরে যাওয়ায় সামান্য জ্যোৎস্না ভ্রমরের কাঁধ ও গলার কাছে এসে পড়েছে। মুখ আরও একটু পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। কোলের ওপর থেকে অমলের হাত তুলে নিয়ে ভ্রমর সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, "আমারও কি ভাল লাগছে!"

"জানি-" অমল ছোট্ট করে বলল, বলল—কেননা ভাবল, এটা তার বলা উচিত।

"আমি একটা কথা বলব—?" ভ্রমর অল্প করে বলল আবার।

"কি?"

"তুমি মন খারাপ করো না।" বলে ভ্রমর কি ভাবল সামান্য, "তুমি এখন দুঃখ পাচ্ছ, ক'দিন পরে আমি আবার ফিরে আসব, তখন দুঃখ থাকবে না।"

অমল ভ্রমরের মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিজের মুঠোয় হাত ধরল ভ্রমরের। শক্ত করে ধরে থাকল। যেন সত্যি-সত্যি সে বিশ্বাস করতে চায় ভ্রমর ফিরে

আসবে, ভ্রমর ফিরে এলে তার দুঃখ থাকবে না।

ভ্রমর অমলের কাঁধের পাশে মাথা রাখল। টাঙাটা আর দুলছে না, সমান গতিতে চলছে, চাকার শব্দ, ঘোড়ার শরীরের শব্দ, ঘণ্টির শব্দ—সব মিলে মিশে পৃথক একটি জগৎ রচনা করেছে এখন। ভ্রমর এই বিচ্ছিন্ন এবং অতি নিভৃত জগতের মধ্যে বসে অমলকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছিল। এবং এই মুহূর্তে সে বিচ্ছেদ বেদনা দুঃখকে নগণ্য ও মিথ্যা করল। বলল, "দুঃখ তুমি ভালবাস না। একদিন এই টাঙাগাড়িতে বসে বলেছিলে, মনে আছে—সেই যে আমরা যেদিন বাজার থেকে ফিরছিলাম।" বলে ভ্রমর অপেক্ষা করল, যেন অমলকে মনে করতে সময় দিল।

অমলের মনে পড়ল না। মনে করার চেষ্টাও সে করল না। দুঃখকে সে সত্যিই ভালবাসে না। কে ভালবাসে! অমল বলল, "দুঃখকে কেন ভালবাসব! কোন লোক ভালবাসে!"

"কেউ বাসে না। কিন্তু দুঃখ ত আছেই। নেই? ...আমার মা বরাবর দুঃখী ছিল। আমিও দুঃখী ছিলাম। ছিলাম না?"

অমল ভ্রমরের মাথায় চিবুক ছোঁয়াল। তার গলার তলায় ঠান্ডা কনকনে ব্যথা লাগছিল, বুকের সবটুকু ফাঁকা—যেন এক মুঠো বাতাস একটা ঘরের মধ্যে ছটফট করে উড়ে বেড়াচ্ছে, পথ পাচ্ছে না বাইরে আসার।

"দুঃখীদের জন্যে বাইবেলে অনেক কথা আছে।" ভ্রমর অতি মৃদু গলায় বলল। নিজেকে এবং অমলকে যেন ভরসা দিচ্ছে, "তোমার দুঃখ হবে, কিন্তু দুঃখই একদিন আনন্দ হয়ে দেখা দেবে।—যীশু বলেছিলেন, এখন দুঃখ সও, কিন্তু আমি আবার এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন সুখী হবে।" আই উইল সি ইউ এগেইন অ্যান্ড ইওর হার্ট শ্যাল রিজয়েস—কথাটা ভ্রমর এখন পরম বিশ্বাসে মনে মনে বলল, বলে শক্তি পেল, সাহস পেল।

অমল ভাবল, বলে—তোমাদের যীশু কিন্তু আর আসেন নি। কিন্তু অমল বলল না, এমন কি কথাটা সে মোটেই ভাবল না। বাইবেল বা যীশু সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ এখন নেই।

"যে ক'দিন আমি না থাকি তুমি কৃষ্ণর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে খেলেটেলে সময় কাটিয়ো; তারপর ত আমি ফিরে আসছি।" ভ্রমর বলল।

কথাটা আচমকা অমলের কানে অন্য রকম শোনাল। সে ঠিক বুঝল না, স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না, তবু মনে হল ভ্রমর যেন বলছে, ভ্রমর একদিন না একদিন ফিরে আসবে, না-আসা পর্যন্ত অমলকে অন্য সঙ্গী নিয়ে সময় কাটাতে হবে। অমলের ভাল লাগল না। সংসারের কোনো অতি নিগূঢ় ও সত্য কথা বয়সকালে অনুভব করতে পারলে মানুষ যেমন বিষণ্ণ হয়, অসহায় বোধ করে, এবং অক্ষম অভিমানে কাঁদে, অমল এই বয়সে সেই রকম কোনো সত্য অনুভব করতে পেরে কাতর ও ক্ষুব্ধ হচ্ছিল।

দু-পাশে ফাঁকা মাঠ পড়েছে। মাঠের কোথাও কোথাও ক্ষেতী। শাক-সবজির ছোট ছোট ক্ষেত। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাঠ মাটি সবজিক্ষেত এবং শূন্যতার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, চাঁদের আলো আরও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, বাতাসও উঠছে। নখের মতন সাদা লাগছিল জ্যোৎস্না, ধোঁয়াকালির মতন দেখাচ্ছিল ক্ষেতক্ষেতী।

অমল হঠাৎ ডাকল, "ভ্রমর—।"

ভ্রমর অমলের কাঁধের ওপর মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে চলেছে। সাড়া দিল মুখ বন্ধ করেই।

"আমি একদিন একটা কিছু করে বসব।" অমল আবেগবশে বলল।

ভ্রমর বুঝল না। বলল, "কি করবে?"

"জানি না। আমার কিছু ভাল লাগছে না।...আমি একদিন মরে যাব।"

অমলের কাঁধ থেকে ভ্রমর মাথা সরিয়ে নিল। অবাক হচ্ছিল সে। মাথা সরিয়ে অমলের দিকে তাকাল ভ্রমর। "কি বলছ! কি বাজে কথা ভাবছ! মরে যাবে কেন?"

"কষ্ট আমার ভাল লাগে না। এত কষ্ট আমি সইব না।"

"আমার জন্যে কষ্ট?"

"হ্যাঁ।...তুমি না থাকলে আমি কিছু কেয়ার করি না। আমি যীশু-টীশু জানি না, ভগবান আমার কি করবে! আমি দেখব, আমি দেখব ক'দিন—তুমি ফিরে না এলে তারপর দেখো কি করি। অমলের গলার মাংস বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, যন্ত্রণায়, কান্নায়, আবেগে, হাহাকারে।

"আমি ফিরব না কেন?" ভ্রমর বলল, বলে অমলের চোখের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। যেন সে বুঝতে পারছে না, অমল কেন ও-কথা বলল, কেন বিশ্বাস করতে পারছে না ভ্রমর ফিরে আসবে!

ভ্রমরের দৃষ্টি সহসা অমলকে সতর্ক ও সচেতন করল; সে বুঝতে পারল তার ও-কথা বলা ভুল হয়ে গেছে, ভীষণ ভুল; আর-একটু হলেই হয়ত ভ্রমর সন্দেহ করত, জানতে পেরে যেত। অমল আবার ভয় পেল, ভয় পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। জবাব দিল না কথার।

"বললে না?" ভ্রমর আবার বলল।

"কি?"

"আমি নাগপুর থেকে ফিরব না কেন? ওখানে আমার কে আছে?"

"জানি না। এমনি বলেছিলাম।...আমার কিছু ভাল লাগছে না। খারাপ লাগছে।" বলেই অমল আর দেরী করল না, বলল, ভ্রমর, আমি খুব ভীতু, আমার হাসপাতাল শুনলে ভয় হয়।"

"তোমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"কে বলল নেই..."

"তাহলে ভগবানকে ও-রকম কথা আর বলো না। তুমি আমি তাঁকে দেখি না, তিনি অনেক দূরে বলে, কিন্তু তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি তোমায় দেখতাম না কোনোদিন, তুমি আমায় দেখতে পেতে না।"

অমল নীরব, তার শরীরের স্নায়ুগুলি কাঁপছিল, তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক অনুভব এসে ধোঁয়ার পুঞ্জের মতন ফেনিয়ে উঠছিল। অমল কিছু বুঝতে পারছিল না, অথচ তার অনুতাপ হচ্ছিল, দুঃখ হচ্ছিল।

ভ্রমর বলল, "আমি যখন নাগপুরে থাকব তুমি কি আমায় দেখতে পাবে?"

"না।"

"আমিও তোমায় দেখতে পাব না।...তবু, তুমি আমার কথা ভাববে সব সময়, আমি তোমার কথা ভাবব।"

"আমিও সারাক্ষণ তোমায় ভাবব, ভ্রমর; সকালে দুপুরে রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও।" অমল ছেলেমানুষের মতন বলল।

"আমিও ভাবব।...ভগবানকেও তুমি ভেবো, দেখতে পাবে না, তবু ভেবো। দূরে যে থাকে তাকে অবিশ্বাস করতে নেই।"

অমলের মনে পড়ে গেল কথাটা। ভ্রমর বলেছিল একদিন, সব ভাল জিনিসই দূরের, অনেক দূরের। ভগবান দূরে থাকেন। ভালবাসাও বোধ হয় ভগবানের মতন দূরে থাকে। অমল মুখ তুলে ভ্রমরকে দেখল। চাঁদের অমন মলিন আলোতেও ভ্রমরের মুখ হিমে-ভেজা ফুলের মতন দেখাচ্ছে, ক্ষীণ শীর্ণ কিন্তু পবিত্র, মলিন অথচ সুন্দর। ভ্রমরের মুখের দিকে তাকিয়ে অমলের মনে হল, ভ্রমরের দুঃখ হচ্ছে, সে কাতর কিন্তু তার ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সে জানে সে ফিরে আসবে। যেন তার অসুখ সত্যিই বাইবেলের লাজার-এর মতন, মৃত্যুতে যার শেষ নেই, সত্যিই ভগবানের মহিমার জন্যে এই অসুখ।

অমল কোমল ও আলতো করে, ভালবেসে ভ্রমরের চোখের কোলে, গালে আঙুল রাখল। মোমের মতন লাগছিল। সামান্য ভেজা। অমল যেন আঙুল দিয়ে ভ্রমরের চোখের কোলের ভিজে ভাবটুকু মুখে দিচ্ছিল, বলল, "ভ্রমর, তোমায় আজ কেমন যেন দেখাচ্ছে—" বলে ভাবল একটু, "প্রতিমার মুখের মতন।" বলেই অমলের মনে দুর্গাপুজোর বিজয়ার দিনের প্রতিমার মুখ মনে পড়ল।

ভ্রমর নম্র স্নিগ্ধ চোখে হাসল। বলল, "খুব বিউটিফুল বললে না যে!"

অমল শুনল; শুনে হাসবার চেষ্টা করল। হাসতে পারল না, যেন এখানকার সমস্ত স্মৃতি ওই একটি কথায় উদ্ভাসিত হল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করল, সে এই স্মৃতি থেকে বিদায় নিচ্ছে। অমল ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেলল, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, মুখ নীচু করে। ভ্রমরও কাঁদছিল।

ওদের কান্নার মধ্যে গাড়ি স্টেশনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, তে-রাস্তার মোড়ের কিছু কিছু কোলাহল ভেসে আসছিল।

অমল বলল, "আর একটু পরেই তুমি চলে যাবে।" বলে সমস্ত বুক খালি করে নিশ্বাস ফেলল।

ভ্রমর মুখ তুলে দূরের স্টেশনের আলো দেখতে দেখতে বলল, "আবার আমি ফিরে আসব।"

অমল কোনো জবাব দিল না।

টাঙাগাড়ি ক্রমশ তে-রাস্তার মোড়ের কাছে এল, তারপরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

অমল কখনও শ্মশানে যায় নি, শ্মশান থেকে ফেরার অনুভূতি তার নেই; তবু ফেরার পথে তার মনে হচ্ছিল, জীবনের সমস্ত সে যেন কারও হাতে তুলে দিয়ে এসেছে, কার হাতে কে জানে, তবে যার হাতে দিয়ে এসেছে সে অতি নির্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন; তার দয়ামায়া মমতা নেই, ভালবাসা নেই। ভ্রমরকে নেবার সময় তার একবিন্দু মমতা হল না।

টাঙাগাড়িটা ফিরে আসছিল। মাত্র একটি টাঙা। পাশে ভ্রমর নেই, কৃষ্ণা আছে। রাত হয়ে আসায় শীত দুঃসহ হয়ে উঠেছে, কুয়াশা নিবিড়, জ্যোৎস্না

চলে যাচ্ছে, পথঘাট শূন্য ও খাঁ-খাঁ করছিল। বাতাস ভেঙেছে, ভেঙে হুহু করে মাঠ-ঘাট রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে-ছুটে যাচ্ছে।

অমল অসাড় স্থির হয়ে বসে ছিল। অনেক দিনের বাস-করা সাজানো গোছানো অভ্যস্ত বাড়ি হঠাৎ খালি ফাঁকা হয়ে গেলে যেমন লাগে, অমলের অনেকটা সেই রকম লাগছিল। তার চারপাশে অস্বাভাবিক শূন্যতা; কেউ নেই; কিছু নেই; সে একা—সে একা-একা একটি শূন্য বাড়িতে বসে আছে।

নাগপুরের মেলগাড়ির চাকা যেন ক্রমাগত অমলের মনের ওপর দিয়ে অনেকগুলি ধারালো ভারী নৃশংস চাকা পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে! অসহ্য কষ্টে এবং যন্ত্রণায় অমল মৃতের মতন পড়ে ছিল। সে অনুভব করতে পারছিল, এই যন্ত্রণার শেষ নেই, হয়ত একদিন সত্যি-সত্যি অমল কিছু করে বসবে।

কৃষ্ণা কি একটা কথা বলল হঠাৎ। অমল শুনতে পেল না। কৃষ্ণা হিহি করে কেঁপে জড়সড় হয়ে বসল। অমল লক্ষ করল না। মনে-মনে সে ভ্রমরকে ভাবল। গাড়ির কামরায় মাঝখানের বেঞ্চে ভ্রমর এতোক্ষণে শুয়ে পড়েছে বোধ হয়, তার চোখের ওপর কামরার হলুদ রঙের বাতিটা জ্বলছে। ভ্রমর শুয়ে-শুয়ে অমলের কথা ভাবছে। গাড়িতে জায়গা করে বসার পর খুব অল্পসময়ের জন্যে ভ্রমর অমলকে পাশে পেয়েছিল। একসময় খুব নীচু গলায় যেন কানে-কানে ভ্রমর বলেছিল, 'এখন আর আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।' তারপর খানিকটা পরে ফিসফিস করে বলেছিল, 'এই, তুমি কিন্তু এখন কাঁদবে-টাঁদবে না; বাবা রয়েছে; তুমি কাঁদলে আমিও...' কথাটা ভ্রমর শেষ করে নি।

ভ্রমর কি এখন শুয়ে-শুয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদছে? কে জানে। অমল বুক ভেঙে নিশ্বাস ফেলল। সে একবার রাস্তা ও মাঠের দিকে তাকাল, জ্যোৎস্না মরে এল, সামান্য দূরে সবজিক্ষেতের দিকে বুঝি কয়েকটি জোনাকি উড়ছে, অমলের দেওয়ালির দিনের কথা মনে পড়ল, ময়দানে জোনাকি-বাজি দেখেছিল দুজনে পাশাপাশি বসে...।

চোখের ভুল, মনের অতি নিভৃত জগৎ থেকে যেমন করে স্বপ্ন উঠে আসে—ভ্রমরও সেই রকম উঠে এল, এসে সেই মৃত জ্যোৎস্নায় কনকনে শীতে অমলের টাঙাগাড়ির পাশে-পাশে চলতে লাগল যেন। অমল ভ্রমরের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, হাওয়ায় ভেসে-ভেসে চলেছে। ছুটেছে যেন। অমল সেই মুখ দেখতে লাগল। কয়েক দণ্ড পরেই হারিয়ে গেল ভ্রমর।

কৃষ্ণা আবার কি একটা কথা বলল, অমল খেয়াল করল না। ঘোড়াটা পিছনের পা তুলে লাফিয়ে উঠেছিল বলেই হয়ত কৃষ্ণা টলে পড়ে যেতে-যেতে অমলের হাত ধরে ফেলেছিল। আবার ঠিক হয়ে বসল। অমল মাঠের দিকে তাকাল, জ্যোৎস্নার গায়ে-গায়ে ছায়ার মতন অন্ধকার এসে যাচ্ছে।

এ বড় আশ্চর্য যে, অমল এখন অনুভব করছিল, তার কোথাও কেউ নেই, সে আত্মীয়-স্বজনহীন; একমাত্র ভ্রমরই তার আত্মীয় ছিল, নিজের ছিল, ভ্রমর না থাকায় সে সম্পূর্ণ একা, তার কোনো আশ্রয় নেই, তাকে ভালবাসার কেউ নেই।

ভালবাসা যে কতটা দেয় অমল এই মুহূর্তে তা অনুভব করতে পারছিল, তার মনে হচ্ছিল, সুখের সমস্তটা এই ভালবাসা—বাঁচার সবটুকু এই ভালবাসা—ভাল লাগার যা কিছু ভালবাসার মধ্যে। ভ্রমর ঠিকই বলত, 'আমরা বড়

নিষ্ঠুর, ভালবাসা জানি না।'

ভালবাসা যে জানে সে ভ্রমরের মতন। ভালবাসা জানলে ভ্রমরের মতন অসুখ করে, ভগবান ভ্রমরের মতন অসুখ দেয়, যে অসুখে রক্তের লালটুকু মরে যায়, মরে গিয়ে মানুষ ফ্যাকাশে হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ভুগে-ভুগে মরে যায়।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল অমল। তার গলায় বুকে আক্রোশ এবং কান্না থমথম করছিল। কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। ভ্রমর তাকে কাঁদতে বারণ করেছে, বলেছে, দুঃখ করো না, আমি আবার ফিরে আসব।

ভ্রমর ফিরে আসবে কিনা অমল বুঝতে পারল না, কিন্তু সে অনুভব করতে পারল, ভ্রমর এখন অনেকটা দূরে; অনেকটা দূরে বলে সে শুধু ভাববে, ভাববে এবং অপেক্ষা করবে।

—